ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ

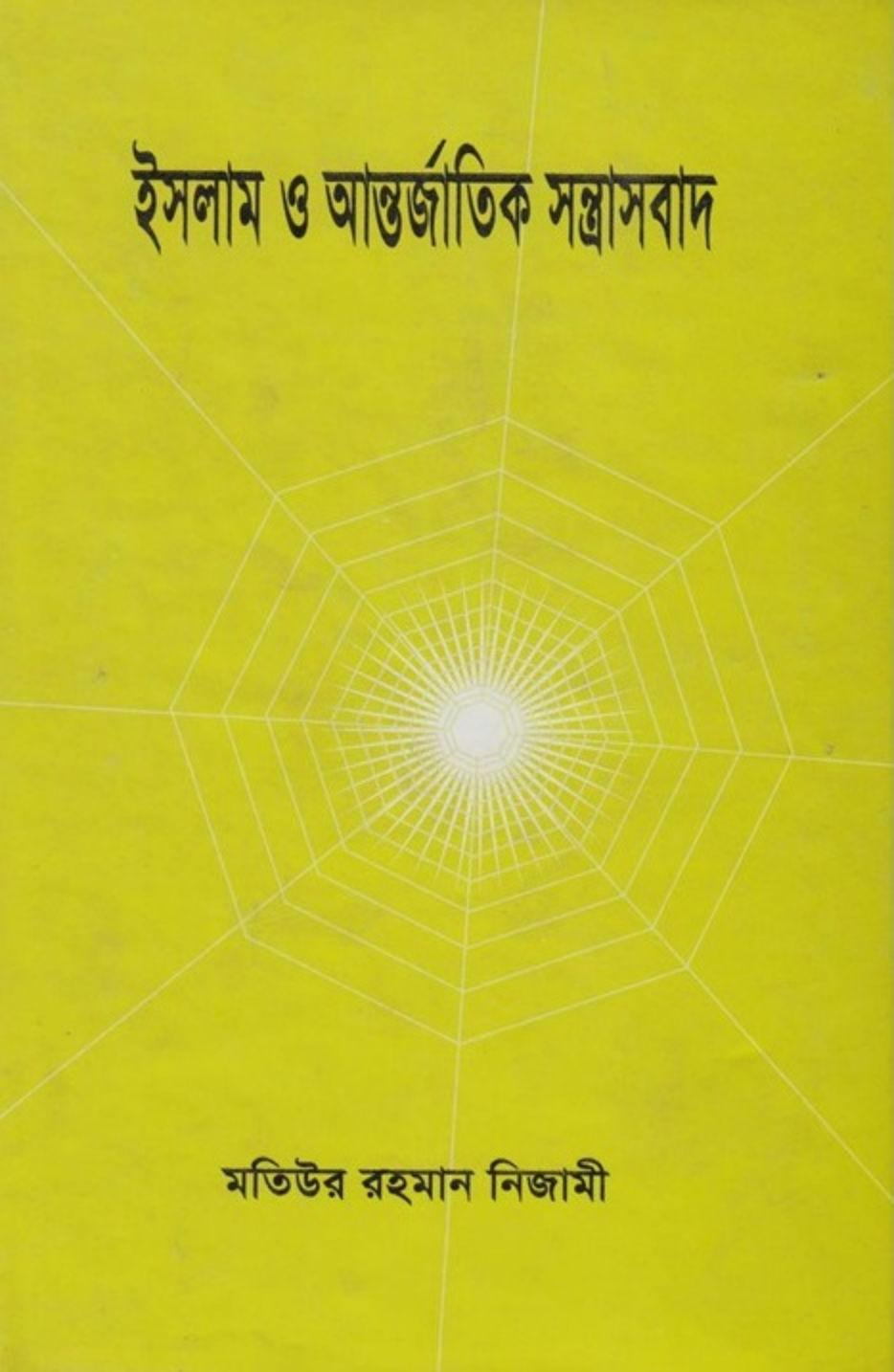

মতিউর রহমান নিজামী

www.pathagar.com

ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ

মতিউর রহমান নিজামী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৪৪

৪র্থ প্রকাশ

মহররম	১৪২৭
ফাল্গুন	১৪১২
ফেব্রুয়ারী	২০০৬

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAM O ANTORJATIK SONTRASHBAD by Matiur Rahman Nizami. Published by Adhunik Prokashani, 25 shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 40.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

* ইসলামের পরিচয় ——— ১১
১. ইসলাম কী ? ——— ১১
ক. তাওহীদ ——— ১৪
খ. রেসালাত ——— ১৭
গ. আখেরাত ——— ১৯
২. ঈমান আনার ব্যাপারে বলপ্রয়োগ নিষেধ ——— ২৩
৩. ঈমান আনার পর আল্লাহর হুকুম পালন বাধ্যতামূলক ——— ২৫
৪. শরীআ আইনের ব্যাপারে পশ্চিমাদের ভুল ধারণা ——— ২৯
৫. ইসলাম সকল নবী-রাসূলের আদর্শ ——— ৩০
৬. ইসলাম বাস্তবসম্মত জীবন বিধান ——— ৩৫
৭. ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার আদর্শ ——— ৩৮
৮. শরীআ আইনের মূল লক্ষ্য ——— ৪৩
* ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা ——— ৪৭
১. ইসলাম প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা ——— ৪৭
২. ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি ——— ৫০
৩. ইসলাম কায়েমের পয়লা ক্ষেত্র স্বদেশ ——— ৫৪
৪. ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদ ——— ৫৮
৫. জিহাদের সঠিক তাৎপর্য ——— ৬০
৬. জিহাদ, যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি ——— ৬৪
* আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ——— ৭৩
১. ইসলামী আন্দোলনের ধারা এক অব্যাহত ধারা ——— ৭৩
২. ইসলামের বিজয় অনিবার্য ——— ৭৮
৩. দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলনের উপর নির্যাতন ——— ৮০
৪. প্রয়োজন বাস্তবধর্মী ভূমিকা ——— ৮৬
৫. ইসলামী আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম ——— ৮৮
* স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সন্ত্রাসবাদ ——— ৯০
১. স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সন্ত্রাসবাদ এক জিনিস নয় ——— ৯০
২. ধর্মীয় জঙ্গীবাদ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও বাংলাদেশ ——— ৯৪
* বাংলাদেশে ইসলামী দলসমূহের ভূমিকা ও একটি পর্যালোচনা — ৯৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের কথা

নেসেসিটি ইজ দ্যা মাদার অব ইনভেনশন' প্রয়োজনই সব আবিষ্কারের উৎস। সেই প্রয়োজন থেকেই আমার এ বইটি লেখা। নাইন ইলেভেনের পর গোটা দুনিয়াকে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে যে পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছে, তাতে এ প্রয়োজন তীব্র হয়ে উঠেছে। টুইন টাওয়ার কারা ধ্বংস করেছে, পেন্টাগণে কারা বিমান বিধ্বস্ত করেছে, তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু বিশ্ব মুসলিমের অজানা এক ব্যক্তিকে এবং অচেনা ইসলামী নামের ভুঁইফোড় একটা গ্রুপকে সন্দেহ করে গোটা মুসলিম উম্মাহকেই আসামী বানানো হয়েছে। ইসলামকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী ধর্ম। আল কুরআনকে ধরে নেয়া হচ্ছে সন্ত্রাসের উৎস। ইসলামী সংস্থা, সংগঠন, এমনকি ইসলামী দাতব্য প্রতিষ্ঠানও আজ তাদের সীমাহীন বৈরীতার শিকার হচ্ছে। সব দেখে শুনে মনে হয় টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়া, মুসলিম বিশ্বের অজানা অচেনা এক ব্যক্তি ও সংগঠনকে এর জন্যে দায়ী করা এবং এ দুইকে সামনে রেখে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সবই একটা সাজানো নাটক। তবে এ নাটকের লক্ষ্য যে মুসলমান, ইসলাম ও আল কুরআনকে সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসের উৎস সাজানো, তা কিন্তু নাটক নয়। আফগানিস্তান ও ইরাকে লাখো জীবনের বিনাশ ও সীমাহীন সম্পদের ধ্বংস এরই সাক্ষ্য।

কম্যুনিজমের পতন ঘটার পর একমাত্র ইসলামই পশ্চিমী ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে থেকে যায়। সব বিবেচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পথ থেকে সরানোই চলমান সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের লক্ষ্য। এ যুদ্ধে তাদের প্রধান অস্ত্র হলো ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হওয়ার অভিযোগ এনে তাদেরকে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের বলি বানানো।

এ মুহূর্তে ইসলামের সঠিক পরিচয় বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা এবং ইসলামের নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করা সময়ের সবচেয়ে বড় দাবী।

www.pathagar.com

এ পুস্তিকায় আমরা সংক্ষেপে ইসলামের পরিচয়, ইসলামের শাশ্বত আদর্শ, ইসলাম প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও পদ্ধতি এবং আধুনিক বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনসমূহের কর্মনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ পুস্তিকায় দেশে দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত দমনাভিযান-এর চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে একথাও পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, কিভাবে উদোরপিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোর মতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে।

আশা করি পুস্তিকাটি মুসলমানদের সচেতন করবে তাদের কর্তব্য নির্ধারণে।

মতিউর রহমান নিজামী
ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামের পরিচয়

১. ইসলাম কী ?

সমসাময়িক বিশ্বে খৃস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইয়াহুদীধর্ম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্মগুলোর পাশাপাশি ইসলামকেও অনুরূপ একটি ধর্ম বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো বিচারেই এ বিবেচনা ন্যায়সঙ্গত ও বাস্তবসম্মত নয়। উল্লিখিত ধর্মগুলো কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু ইসলামের নামকরণের সাথে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা স্থানের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। ইসলাম তাই প্রচলিত ও সীমিত অর্থে নিছক একটি ধর্মমাত্র নয়। ইসলাম সার্বজনীন বিশ্বজনীন একটি আদর্শ—যা সর্বকালের, সর্বযুগের এবং সকল মানুষের জীবন জিন্দেগীর সকল দিক ও বিভাগের সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। ইসলামের মূল পরিচয় "ইসলাম" শব্দটির অর্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের মধ্যেই নিহিত। ইসলামের শাব্দিক অর্থ আত্মসমর্পণ করা, নিরংকুশ আনুগত্য প্রদর্শন করা। ইসলাম শব্দের মূল ধাতু سلم অর্থ শান্তি। মানুষের দেহ ও আত্মার পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও প্রশান্তির জন্যেই এ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। এ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য সৃষ্টিজগতের কারো কাছে নয় গোটা সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ও সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, নিরংকুশ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মালিক রাব্বুল আলামীনের কাছেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসমান-যমীনের স্রষ্টা, আসমান-যমীনের মাঝে যাকিছু আছে সে সবের স্রষ্টা এবং সবকিছুর মালিক মুখতার, সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে যা বুঝায় সেই ক্ষমতার নিরংকুশ অধিকারীও তিনি। তাঁর প্রতি নিরংকুশ ও নির্ভেজাল আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ যে আদর্শের ভিত্তি তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যে কল্যাণকর। এতে সন্দেহ সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

ইসলামের এ যথার্থ পরিচয় উপলব্ধি করতে হলে যার পক্ষ থেকে ইসলাম এসেছে তাঁর সঠিক পরিচয় জানা এবং বুঝা অপরিহার্য। আল্লাহ সম্পর্কে যাদের সঠিক ধারণা নেই, আল্লাহর সঠিক পরিচয় জানা নেই, তাদের পক্ষে ইসলামী আদর্শের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারী বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-চেতনা ও লেখনীতে ইসলাম সম্পর্কে যে বিভ্রান্তি দেখা যায়, তার মূল রহস্য এখানেই।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কুরআন শরীফে সূরায়ে ফাতেহার প্রথম ৪টি আয়াতে স্বয়ং নিজের যে পরিচয় তুলে ধরেছেন, তা খুবই তাৎপর্যবহ এবং প্রণিধানযোগ্য। এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রথম পরিচয় দিয়েছেন رَبُّ الْعَالَمِيْنَ হিসাবে।

সৃষ্টিজগতের সবকিছুর স্রষ্টা তিনি, সবকিছুর লালন-পালনকারীও তিনি, সবকিছুর উপর একক কর্তৃত্ব চলছে তাঁরই। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। সৃষ্টিজগতের সবকিছু আল্লাহর হুকুমে চলে। মানুষকেও তেমনি তাঁর গোটা জীবন-জিন্দেগী তাঁরই হুকুমের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে। মানুষ কেবল তাঁরই প্রশংসা করবে, তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, একমাত্র তাঁরই গোলামী বন্দেগী করবে। এতে আর কাউকে কোনো রকমের অংশিদারিত্ব বা শরীকানা দেবে না। এখানে এটাও প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ তাঁর পরিচয়ে তাঁকে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন। এ সত্তার পক্ষ থেকে আগত কোনো আদর্শ তাই কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর জন্যে নয় সকলের জন্যে গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণকর হবে এটাই স্বাভাবিক।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সূরায়ে ফাতেহার প্রথম আয়াতে সৃষ্টিজগতের উপর তাঁর নিরংকুশ কর্তৃত্বের ঘোষণার পাশাপাশি দ্বিতীয় আয়াতে اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এ দুটি গুণবাচক নামের উল্লেখ করে তাঁর শক্তিমত্তার পাশপাশি দয়ালু ও মেহেরবান হিসাবেও নিজের পরিচয় দিয়েছেন। পরম পরাক্রমশালী আল্লাহর পরিচয় যেমন মানুষের মনে ভয়-ভীতির সঞ্চার করে, তেমনি দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর পরিচয় মানুষকে অভয় দান করে। মানুষ নিজে নিজের ভাল-মন্দ, কল্যাণ-

www.pathagar.com

অকল্যাণ সম্পর্কে যত চিন্তা-ভাবনা জ্ঞান-গবেষণাই করুক না কেন আজ পর্যন্ত সে এতে কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। মানুষের স্রষ্টা দয়ালু মেহেরবান আল্লাহ ছাড়া মানুষের প্রকৃত কল্যাণ আর কেউ চাইতে পারে না, দিতেও পারে না। আল্লাহ যে বিধান মানব জাতির জন্যে দিয়েছেন দয়ালু মেহেরবান হিসাবে দিয়েছেন। উক্ত বিধানে তাঁর মেহেরবানীরই প্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহ তাআলার দয়ালু মেহেরবান পরিচয়ের পাশাপাশি مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ হিসাবে তাঁর পরিচিতি উল্লেখ করেছেন। এটা মূলত রাব্বুল আলামীন পরিচয়েরই একটি দিক। অর্থাৎ তাঁর কর্তৃত্ব যেমন ইহজগতে নিরংকুশ, পরজগতেও তেমনি নিরংকুশ। রাব্বুল আলামীনের খলীফা হিসাবে মানুষ তার উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা না করার চূড়ান্ত প্রতিদান ও প্রতিফল ভোগ করবে পরকালে চূড়ান্ত বিচারের পর। সেই বিচার দিবসের একক অধিপতি মালিকও তিনি। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ পরিচয় উপস্থাপনের পর মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্কের ধরন ও প্রকৃতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি মানব জাতির আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য লাভের একক সত্তা। তিনি ব্যতীত মানুষ আর কারো কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে না, কারো দাসত্ব ও আনুগত্য করতে পারে না, কারো শরণাপন্ন হতে পারে না, কারো কৃপা ভিখারী হতে পারে না। যার অনিবার্য দাবী হলো মানুষ এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে রব বা ইলাহ মানবে না। কারো দাসত্ব ও গোলামী করবে না। এভাবে আল্লাহ মানুষের রব আর মানুষ আল্লাহর দাস। আল্লাহ ও বান্দার এ সম্পর্ক সরাসরি। এতে মধ্যস্বত্বভোগীর কোনো স্থান নেই। আল্লাহ ও মানুষের মাঝে বাঞ্ছিত এ সম্পর্ক গড়ে তোলা ও সংরক্ষণের যে উপায় ও পদ্ধতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সর্বযুগের, সর্বকালের নবী-রাসূলদের মাধ্যমে এসেছে মূলত সেই উপায় ও পদ্ধতির নামই ইসলাম।

সূরায়ে ফাতেহার শেষ অংশে আমরা তাই দিকনির্দেশনা পাই মানুষের জীবন যাপনের সহজ-সরল, সঠিক ও টেকসই পথের সন্ধান কামনার মাধ্যমে। সে পথ নতুন নয় বরং অতীতে আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের অনুসৃত পথ। একই সাথে বিভ্রান্ত, অভিশপ্ত ব্যক্তিদের পথ পরিহার করার শক্তি কামনাও লক্ষণীয়।

www.pathagar.com

উপরোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সঠিক পরিচয় সামনে রেখে তাঁকে একমাত্র রব, ইলাহ, মালিক বা সার্বভৌম ক্ষমতার একক অধিপতি হিসাবে স্বীকার করে নেয়ার অনিবার্য দাবী অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্যে যে পথ ও পন্থা বেছে নিতে হয়, সেটাই ইসলাম। এ ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। যার প্রথমটি হলো ঈমানের ঘোষণা, দ্বিতীয়টি নামায কায়েম করা, তৃতীয়টি যাকাত আদায় করা, চতুর্থটি রমযান মাসের রোযা পালন, পঞ্চমটি হলো অর্থনৈতিক সংগতিপূর্ণ ব্যক্তিদের হজ্জ পালন। এ পাঁচটি বুনিয়াদকে আমরা দুভাগে ভাগ করেও আলোচনা করতে পারি। অর্থাৎ ঈমানিয়াত ও বুনিয়াদি ইবাদাত। ইসলামকে জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করার আগে কতগুলো মৌলিক বিষয়ের প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিতে হবে। উক্ত বিষয়গুলো আল্লাহ, ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাবসমূহ, নবী রাসূলগণ, আখেরাত, তাকদীর এবং মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া। এ সাতটি বিষয়ের মধ্যে মৌলিক ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তিনটি—তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত।

ক. তাওহীদ

তাওহীদ মূলত আল্লাহর প্রতি ঈমানের পূর্ণতা ও যথার্থতা বুঝানোর জন্যে একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। যার সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে ঈমানে মুজমালে উল্লেখিত কয়েকটি আরবী বাক্যাংশের মাধ্যমে। উক্ত আরবী বাক্যাংশগুলো হলো ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ۔

অর্থ ঃ আমি বিশ্বাসস্থাপন করলাম আল্লাহর প্রতি যেমনিভাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত, আরো বিশ্বাসস্থাপন করলাম তাঁর নামসমূহের প্রতি, তাঁর গুণাবলীর প্রতি এবং তাঁর সমস্ত হুকুম আহকাম আমি কবুল করলাম।

এর মর্মার্থ হলো আল্লাহর প্রতি ঈমানের ব্যাপারে শুধু আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। বরং আল্লাহর সঠিক ও যথাযথ পরিচয়কে সামনে রেখে তাঁর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিতে হবে। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর মূল সত্তার (জাতের) এবং গুণাবলীর (সিফাতের) যে বর্ণনা দিয়েছেন

www.pathagar.com

তার আলোকেই তাকে জীবন জিন্দেগীর সকল ক্ষেত্রের, সকল দিক ও বিভাগের রব, ইলাহ ও মালিক হিসাবে মেনে নেয়ার অঙ্গীকার আল্লাহর প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবী। এজন্যে ঈমানে মুজমালের আরবী বাক্যসমূহের শেষাংশে উচ্চারিত হয়েছে ঃ

وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ۔

"আর মেনে নিলাম তার সকল বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী।"

'তাওহীদ' শব্দটির সাধারণত অর্থ করা হয় 'একত্ববাদ'। কিন্তু 'একত্ববাদ'-তরজমা তাওহীদের পূর্ণ পরিচয় বহন করে না। তাওহীদের মূলকথা এক আল্লাহর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ স্বীকৃতি। তাওহীদের যথাযথ অনুসরণের জন্যে শিরক সম্পর্কে ধারণা থাকা অপরিহার্য। পরিপূর্ণরূপে শিরক বর্জন ছাড়া তাওহীদের অনুসারী হওয়া যায় না।

তাওহীদ ও শিরক এর চারটি দিক রয়েছে, যেগুলো হলো ঃ

প্রথম দিক ঃ আল্লাহর 'জাত'-এর ক্ষেত্রে তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় মানা তাওহীদের দাবী। আর এ ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর অংশীদার মনে করা হবে পরিপূর্ণ শিরক। ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী খৃষ্ট সমাজ পিতা, পুত্র ও মাতার প্রসঙ্গ এনে আল্লাহর জাতে শিরক করে আল্লাহর তাওহীদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইহুদী গোষ্ঠী হযরত ওযায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্র সন্তান হিসাবে উল্লেখ করে একই বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতির শিকার হয়েছে। অনুরূপভাবে পারসিক ধর্মাবলম্বীগণ ভাল ও মন্দের ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা বলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জাত বা মূল সত্তার একক ও অদ্বিতীয় হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করতে ও স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

দ্বিতীয় দিক ঃ আল্লাহর 'জাত'-এর ক্ষেত্রে তিনি যেমন এক ও অদ্বিতীয়, তেমনি তাঁর গুণাবলীতেও তিনি একক ও অদ্বিতীয়। রব, ইলাহ ও মালিক এ তিনটি গুণবাচক নাম যে অর্থ বহন করে তা কেবল আল্লাহর জন্যেই সুনির্দিষ্ট। সৃষ্টিজগতের আর কারো জন্যে এটা প্রযোজ্য নয়। আর কাউকে কোনোভাবে এ অর্থে ডাকা আল্লাহর গুণাবলীতে

www.pathagar.com

শিরক করা হিসাবে বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে কুরআন শরীফে আল্লাহর কিছু গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট গুণবাচক নাম ছাড়াও আল্লাহর কুদরতে কামেলা, নিরংকুশ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির যেসব বর্ণনা দেয়া হয়েছে সৃষ্টিজগতের কাউকে অনুরূপ গুণের মালিক বিবেচনা করা আল্লাহর গুণাবলী বা সিফাতে শিরকের শামিল।

তৃতীয় দিক ঃ আল্লাহর হক বা অধিকার-এর ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করা যাবে না। এখানে আল্লাহর অধিকার বলতে বুঝায় মানুষ একমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদাত বন্দেগী করবে। এ ইবাদাত বন্দেগী হতে হবে নির্ভেজাল ঃ

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ○ـ البينة : ٥

অর্থ ঃ "আর তাদেরকে এছাড়া অন্য কোনো হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর বন্দেগী করবে, নিজেদের দীনকে তাঁরই জন্য খালেস করে সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে ; আর নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। মূলত এটাই অতীব সত্য সঠিক ও সুদৃঢ় দ্বীন।"–সূরা আল বাইয়েনাহ ঃ ৫

চতুর্থ দিক ঃ আল্লাহর ইখতিয়ার, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সার্বভৌমত্বের প্রসঙ্গটি চতুর্থ বিষয়। গোটা বিশ্বলোকে এক আল্লাহর নিরংকুশ কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। মানুষের সমগ্র জীবনে আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়াটাই তাঁর প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবী। এখানে আল্লাহর কর্তৃত্বের পাশে কাউকে স্থান দেয়াটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর এ কর্তৃত্ব অস্বীকার করা হবে কুফরী ঃ

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○ ـ ال عمران : ٨٣

অর্থ ঃ "এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্য করার পন্থা (দ্বীন) পরিত্যাগ করে অন্য কোনো পন্থা গ্রহণ করতে চায় ? অথচ আকাশ ও

www.pathagar.com

পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তাঁরই নির্দেশের অধীন (মুসলিম) হয়ে আছে। আর মূলত তাঁরই দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩

এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তাহলো, যেহেতু আসমান-যমীন এবং এর মধ্যকার গোটা সৃষ্টি এক আল্লাহর নিরংকুশ আনুগত্য করে চলছে এবং সেই কারণে সৃষ্টিজগতের সর্বত্র নিয়ম-শৃংখলা সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। মানুষের সমাজে যদি ঐ আল্লাহর আইন-কানুন, বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয় তাহলে এখানে অনুরূপ নিয়ম-শৃংখলা, সার্বভৌমত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। এখানে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। গোটা সৃষ্টিলোকে আল্লাহর বিধি-বিধান যা প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে পরিচিত এটা আল্লাহ স্বয়ং কার্যকর করেছেন। এখানে এ বিধি-বিধান, নিয়মনীতি মানা না মানার কোনো স্বাধীনতা প্রাকৃতিক বিশ্বের কোনো সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। মানুষ ও মানুষের সমাজ এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। মানুষ যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টির সেরা এবং পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি তাই মানুষের সমাজ ও জীবনের জন্যে আল্লাহর আইন-কানুন ও বিধি-বিধান কায়েম করার বা জারি করার দায়িত্বটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকেই দেয়া হয়েছে এবং এটা মানা না মানার প্রতিদান ও পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে যথাযথভাবে অবহিত করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে মানুষকে আল্লাহ তাআলা স্বাধীনতাও দিয়েছেন। অন্যথায় আল্লাহ চাইলে গোটা প্রাকৃতিক বিশ্বের ন্যায় মানুষের সমাজেও আল্লাহর আইন কার্যকর হতো।

খ. রেসালাত

মাটির এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছেন মানব জাতিকে। আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের এ দায়িত্ব পালনে আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। আর তাঁদের সাথে নাযিল করেছেন আসমানী কিতাব ও সহীফা। বিশ্বের প্রথম মানুষ একজন নবী এবং সমস্ত মানুষ তাঁর বংশধর। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা), সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন। সমস্ত নবী-রাসূলগণ ছিলেন মানুষ। মানুষের মতই তাঁরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছেন।

২—

www.pathagar.com

আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহির মাধ্যমে তাঁরা মানব জাতিকে আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগীর দাওয়াত দিয়েছেন। তাওহীদের অনুসারী হিসাবে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহর আইন কানুন মেনে চলার বাস্তব শিক্ষা দিয়েছেন এবং একই সাথে আল্লাহর নাফরমানির পরিণাম, পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক সাবধান করেছেন। বিশেষ করে আখেরাতের জিন্দেগী সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দিয়ে মানুষের ইহলৌকিক জীবনকে মার্জিত ও পরিশোধিত করার প্রক্রিয়া দিয়েছেন। বিস্ময়কর ও লক্ষণীয় বিষয় হলো সকল নবী-রাসূলগণ আল্লাহর তাওহীদ প্রসঙ্গে, মানুষের মর্যাদা ও দায়িত্ব কর্তব্য প্রসঙ্গে এবং মানুষের সাফল্য ব্যর্থতাসহ তাদের সর্বশেষ ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নাম প্রসঙ্গে এক ও অভিন্ন শিক্ষা প্রচার করেছেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মত হিসাবে আমাদেরকে পূর্বের সকল নবীর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিতে হয়। ঈমানের ঘোষণা দিতে হয় অতীতের সকল আসমানী কিতাবের প্রতিও। সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিলের এবং নবী-রাসূল প্রেরণের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যবস্তু হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যে সামাজিক ন্যায় ও ইনসাফ নিশ্চিত করাকে। অতীতের আসমানী কিতাব এবং নবী রাসূলদের শিক্ষা অবিকৃত অবস্থায় নেই। সকল নবীর এবং সকল আসমানী কিতাবের মূল বিষয়গুলো শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও সর্বশেষ কিতাব আল কুরআনের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার সব মানুষের কাছে পৌঁছানোর একটি বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন রাব্বুল আলামীন হিসাবে। তাঁর সর্বশেষ নবীর পরিচয় দিয়েছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসাবে। রেসালাতের প্রতি বিশ্বাসের অনিবার্য দাবী হলো আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব আল কুরআনকে কিতাব হিসাবে যথাযথ মর্যাদাসহ জীবনের সকল দিক ও বিভাগের দিশারী হিসাবে পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করতে হবে। কুরআনের বাহক শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) কুরআনের প্রতিটি শিক্ষাকে যেভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করেছেন সেভাবেই অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

www.pathagar.com

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○ ـ الحشر : ٧

অর্থ ঃ "রাসূল তোমাদের যাকিছু প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন তা থেকে তোমরা বিরত হয়ে যাও। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।"–সূরা আল হাশর ঃ ৭

গ. আখেরাত

মানুষকে এ দুনিয়ায় প্রেরণের মুহূর্তে মানুষের স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মাটির এ পৃথিবী তাদের স্থায়ী নিবাস নয়। এখানে তারা কিছুদিন অবস্থান করবে মাত্র। এ দুনিয়ার জীবন শেষে আবার তাদেরকে জীবিত করা হবে এবং দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনের কার্যক্রমের চুলচেরা হিসাব নেয়া হবে। সেই হিসাব এবং জবাব দুই এর আলোকে নির্ণয় করা হবে আল্লাহর খলীফা হিসাবে কারা সফলতা লাভে সক্ষম হয়েছে, আর কারা হয়েছে ব্যর্থ। দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনকে কিভাবে পরিচালনা করবে সেই ব্যাপারে দয়ালু মেহেরবান আল্লাহ যে ব্যবস্থা করেছেন তার আলোচনা একটু আগে আমরা রেসালাত অধ্যায়ে করেছি। আখেরাত বিশ্বাসের অর্থ দুনিয়াত্যাগী বা বৈরাগ্যবাদী হওয়া নয়, বরং দুনিয়াটাকে অস্থায়ী নিবাস ও পরীক্ষাগার মনে করে নবী-রাসূলগণের ও আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষার আলোকে আখেরাতে জবাবদিহির পূর্ণ অনুভূতি নিয়ে এ দুনিয়াটা পরিচালনা করা, যা ঈমানেরই অনিবার্য দাবী। আখেরাত বিশ্বাস জীবন ও জগত সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন করে। আখেরাতের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস মূলত আল্লাহর অধিকার (হক্কুল্লাহ) ও মানুষের অধিকার (হক্কুল ইবাদ) আদায় ও সংরক্ষণে চালিকা শক্তির ভূমিকা পালন করে থাকে। আখেরাতে জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া কুরআনের বর্ণনার আলোকে নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহ স্বয়ং মানুষের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল ঃ

www.pathagar.com

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ ـ البقرة : ٢٨٤

অর্থ ঃ "আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর আর না-ই কর, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের থেকে সে সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করবেন। অতপর যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন ; এটা তাঁর ইখতিয়ার, তিনি সর্বশক্তিমান।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৪

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○ ـ الحشر : ١٨

অর্থ ঃ "আল্লাহকেই ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চিতই তোমাদের সেসব আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করতে থাক।"–সূরা আল হাশর ঃ ১৮

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○ـ التغابن : ٤

অর্থ ঃ "পৃথিবী ও আকাশজগতের প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনি জানেন। তোমরা যা কিছু গোপন কর, আর যা কিছু প্রকাশ কর তা সবই তিনি জানেন। তিনি দিলসমূহের অবস্থাও জানেন।"-সূরা আত তাগাবুন ঃ ৪

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ج وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ○ـ ق : ١٦

অর্থ ঃ "আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি। আর তার দিলে নিত্য জাগ্রত কুচিন্তাগুলো (অসওয়াসাগুলো) পর্যন্ত আমরা জানি। আমরা তার গলার শিরা থেকে অধিক নিকটবর্তী।"–সূরা আল ক্বাফ ঃ ১৬

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ মানুষের আমল বা কার্যক্রম রেকর্ড করার জন্যে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের জন্যে ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন।

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ○ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ○ـ ق : ١٧ـ١٨

অর্থ ঃ "(আর আমাদের এ সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) দুজন লেখক তার ডান ও বাম দিকে বসে প্রত্যেকটি জিনিস লিপিবদ্ধ করে রাখছে। কোনো শব্দও তার মুখে উচ্চারিত হয় না যার সংরক্ষণের জন্যে একজন চির উপস্থিত পর্যবেক্ষক মওজুদ থাকে না।"

–সূরা আল ক্বাফ ঃ ১৭-১৮

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ○ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ○ـ الانفطار : ١١ـ١٢

অর্থ ঃ "এমন সম্মানিত লেখক যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজই জানে।"–সূরা আল ইনফিতার ঃ ১১-১২

এ আখেরাত মানুষের শেষ ঠিকানা। এ ঠিকানার পহেলা মনযিল মৃত্যু। মৃত্যু শেষ কথা নয়। মৃত্যুর পর কেয়ামত পর্যন্ত অবস্থান আখেরাত নামক শেষ ঠিকানার দ্বিতীয় মনযিল। তৃতীয় মনযিল কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং পুনরায় জীবিত হওয়া ও চূড়ান্ত জবাবদিহির জন্যে আল্লাহর দরবারে ধাবিত হওয়া। এখানেই তাদের দুনিয়ার কার্যক্রমের আমলনামা প্রদান করা হবে, যা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে স্বগত উক্তি করবে ঃ

مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا ج

অর্থ ঃ "হায়রে দুর্ভাগ্য! এটা কেমন কিতাব যে, আমাদের ছোট বড় কোনো কাজই এমন থেকে যায়নি যা এতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।"

–সূরা আল কাহফ ঃ ৪৯

এখানে আত্মপক্ষ সমর্থনের আর কোনো সুযোগ থাকবে না, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে ঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ○

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "আজ আমরা এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। এদের হাত আমাদের সঙ্গে কথা বলবে, আর এদের পাগুলো সাক্ষ্য দিবে যে, এরা দুনিয়ায় কি কি করছিল।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৬৫

সেখানে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ـ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ○ ـ الانفطار : ١٩

অর্থ ঃ "এটা সেদিন যখন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো হবে না। সেদিন ফায়সালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারেই হবে।"–সূরা আল ইনফিতার ঃ ১৯

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ○ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ○ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ○ـ عبس : ٣٤

"সেদিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মাতা, নিজের পিতা, নিজের স্ত্রী ও নিজের সন্তানদের কাছ থেকে পালাবে।"–সূরা আবাসা ঃ ৩৪

এভাবে চূড়ান্ত জবাবদিহির পর একদল জান্নাতী আর একদল জাহান্নামী হিসাবে চিহ্নিত হবে। কুরআন ও হাদীসে জান্নাতের আকর্ষণীয় বর্ণনা এবং জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্যকে সামনে রেখে জাহান্নাম থেকে বাঁচার এবং জান্নাতী হওয়ার লক্ষ্যে যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়াই ঈমান বিল আখেরাতের অনিবার্য দাবী।

❐

www.pathagar.com

২. ঈমান আনার ব্যাপারে বলপ্রয়োগ নিষেধ

উল্লিখিত মৌলিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান প্রসঙ্গে আমরা যে আলোচনা করলাম, তাই মূলত ইসলামী আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি। এ বিশ্বাস আনয়নের ক্ষেত্রে ইসলামে বলপ্রয়োগের বা জবরদস্তির কোনো সুযোগ নেই। মানুষের কাছে সত্য ও মিথ্যার, ন্যায় ও অন্যায়ের, হেদায়াত ও গোমরাহীর বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা ছিল নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব। এরপর ঈমান আনা না আনার বিষয়টি মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সূরা আল বাকারায় আয়াতুল কুরসী নামক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার সুস্পষ্ট বর্ণনা দেয়ার পরে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন ঃ

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قف قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقٰى ق لَاانْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ ـ البقرة : ٢٥٦

অর্থ ঃ "দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। প্রকৃত শুদ্ধ ও নির্ভুল কথাকে ভুল চিন্তাধারা থেকে ছাঁটাই করে পৃথক করে রাখা হয়েছে। এখন যে কেউ 'তাগুতকে' অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করবে, যা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয় এবং আল্লাহ (যার আশ্রয় সে গ্রহণ করেছে) সবকিছু শ্রবণ করেন ও সবকিছু জানেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ঘোষণা করেছেন ঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ قف فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ز اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ز اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ط وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ط بِئْسَ الشَّرَابُ ط وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ○ ـ

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "স্পষ্ট বলে দাও, এ মহা সত্য তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে এসেছে। এখন যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং যার ইচ্ছা অমান্য করবে। আমরা যালেমদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি, যার লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেবে। সেখানে তারা যদি পানি চায় তাহলে এমন পানি তাদেরকে পরিবেশন করা হবে যা পুঁজের মত হবে এবং তাদের মুখাবয়ব দগ্ধ করে দেবে। এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পানীয় এবং অতিশয় খারাপ আশ্রয়স্থল।"–সূরা কাহ্‌ফ ঃ ২৯

অতএব জবরদস্তি করে কাউকে ঈমান আনতে বাধ্য করার কোনো ধারণা ইসলামে নেই।

❐

www.pathagar.com

৩. ঈমান আনার পর আল্লাহর হুকুম পালন বাধ্যতামূলক

ঈমানের পর ইসলামের পাঁচ বুনিয়াদের চারটি বিষয়কে একটি অধ্যায়ে বুনিয়াদী ইবাদাত হিসাবে উল্লেখ করেছি। এখানে উল্লেখ করা দরকার এ ইবাদাতগুলো কেবলমাত্র তাদের জন্যেই বাধ্যতামূলক যারা ঈমানের ঘোষণা দেয়। ঈমান আনা না আনার ব্যাপারে যেমন স্বাধীনতা রয়েছে, ঈমান আনার পর আল্লাহর হুকুম, আইন-কানুন, বিধি-বিধান মানা না মানার ব্যাপারে কিন্তু তেমনটি নয়। ঈমান যারা আনে তারা আল্লাহর হুকুম মানার জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অতএব এখানে আল্লাহর হুকুম মানা না মানার ইখতিয়ারের প্রশ্নই অবান্তর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা অত্যন্ত স্পষ্ট ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ○

অর্থ ঃ "কোনো মু'মিন পুরুষ ও কোনো মু'মিন স্ত্রীলোকের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা দেবেন তখন সে নিজের সে ব্যাপারে নিজে কোনো ফায়সালা করার ইখতিয়ার রাখবে। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হলো।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৬

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

অর্থ ঃ "না, হে মুহাম্মাদ, তোমার রবের শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয়সমূহে তোমাকে বিচারপতি রূপে মেনে নেবে। অতপর তুমি যাই ফায়সালা করবে তার সম্মুখে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬৫

www.pathagar.com

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

অর্থ ঃ "ঈমানদার লোকদের কাজ তো এই যে, যখন তাদের আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হবে, যেন রাসূল তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন, তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। বস্তুত এরূপ লোকেরাই কল্যাণ লাভ করে।"–সূরা আন নূর ঃ ৫১

আমরা যে তিনটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিলাম এগুলোর পরিধি চারটি বুনিয়াদি ইবাদাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ মৌলিক ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের বাইরে মানুষের জীবন ও সমাজের সকল দিক ও বিভাগ এর আওতাধীন। এ মৌলিক ইবাদাতগুলো নিছক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এগুলোর শিক্ষা সুদূরপ্রসারী। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সাথে যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নামায নিছক একটি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নামায মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। নামাযের মাধ্যমে মানুষের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হলো আল্লাহর যিকির ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবন পরিচালনা করা। সেই সাথে নামায মানুষকে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নীতি গর্হিত অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ○ ـ العنكبوت : ٤٥

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যিকির এ থেকেও অধিক বড় বিষয়। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কিছু করো।"–সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪৫

তেমনিভাবে যাকাত ভিক্ষা বা ট্যাক্স নয় বরং একটি মৌলিক বা বাধ্যতামূলক ইবাদাত। যার অনিবার্য দাবী হলো ধনীর ধন-সম্পদে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত গরীব ও বঞ্চিতদের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা।

www.pathagar.com

রোযা আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে দায়িত্ব পালনে মানুষকে অভ্যস্ত করার সবচেয়ে কার্যকর একটি ইবাদাত যা মানুষকে সংযমী হওয়ার শক্তি যোগায়, সংযত জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে, সময়ানুবর্তিতা-নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলনের মাধ্যমে সুশৃংখল জীবন যাপনে সাহায্য করে। সমাজ জীবনের উপর এর প্রভাব সুদূর প্রসারী।

হজ্জ একই সাথে আর্থিক কুরবানী ও শারীরিক পরিশ্রম সম্বলিত একটি ব্যাপক ইবাদাত। যার মাধ্যমে সারা দুনিয়ার সচ্ছল বা সঙ্গতিপূর্ণ ব্যক্তিগণ এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দেয়ার সুযোগ পায়।

আরো সুযোগ পায় অহংকারবোধ ত্যাগ করে সব মানুষ এক আল্লাহর গোলাম এবং পরস্পর একে অপরের ভাই, কেউ কারো প্রভু নয়, কেউ কারো গোলাম নয়, এর বাস্তব মহড়া দেয়ার। অতএব এ চারটি মৌলিক ইবাদাতের সাথে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সাথে রয়েছে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক। এরই ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহ খায়রা উম্মাহ (শ্রেষ্ঠ জাতি) হিসাবে, উম্মাতে ওয়াসাত (মধ্যমপন্থী জাতি) হিসাবে সারা দুনিয়ার মানুষের অনুকরণ অনুসরণযোগ্য হতে পারে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। সকল মানুষকে সৎপথে চালাবার, অসৎপথে বাধা দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে পারে। মানুষের বৃহত্তর জীবনের সাথে এ মৌলিক ইবাদাতগুলোর যে সম্পর্কের কথা প্রসঙ্গত আমরা আলোচনা করলাম সেই বৃহত্তর ব্যবহারিক জীবনের জন্যেও আল্লাহ তাআলার নির্দেশ রয়েছে। সকল নবী রাসূলদের মাধ্যমে যা এসেছে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমেও তাই এসেছে। আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল (সা)-এর প্রদর্শিত নির্দেশনা থেকে ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ص وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ ـ البقرة : ٢٠٨

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২০৮

কুরআনের মূল কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু মানুষ ও মানুষের সমাজ। একটি সুখী, সুন্দর, শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায় ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠাই কুরআনী আদর্শের মূল দাবী।

তাই সমাজ জীবনের প্রাথমিক ইউনিট পরিবার গঠন ও পরিচালনা থেকে শুরু করে সমাজ ব্যবস্থা, বাণিজ্য, আইন-আদালত, রাষ্ট্র-প্রশাসন সব ক্ষেত্রেই কুরআনের মৌলিক দিকনির্দেশনা এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। ঈমানের অনিবার্য দাবী হলো এর সবটাকে পালন করতে হবে, আংশিক মানা আংশিক না মানার কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহ তাআলার ঘোষণা ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ○– البقرة : ٨٥

অর্থ ঃ "তবে তোমরা কি কিতাবের একাংশ বিশ্বাস কর এবং অপর অংশকে কর অবিশ্বাস ? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদের কঠোরতম শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছো তা আল্লাহ মোটেই অজ্ঞাত নন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৮৫

www.pathagar.com

৪. শরীআ আইনের ব্যাপারে পশ্চিমাদের ভুল ধারণা

অধুনা পশ্চিমা জগত ইসলামের শরীআ ভিত্তিক আইন চালুর বিষয়ে দুনিয়া ব্যাপী বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা জোরদার করেছে। তাদের চতুর্মুখী প্রচারণার ভাব-ভঙ্গির প্রকৃতি থেকে মনে হয় শরীআ বাস্তবায়নের বিষয়টি বাদ দিয়ে মুসলমানরা যদি নিছক অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মের অনুসারী হয়, তাহলে তারা স্বস্তি পায়। ইসলামের বিরুদ্ধে মৌলিক মানবাধিকার লংঘনের শ্লোগান মূলত তাদের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। সেই সাথে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ও বিদ্বেষপ্রসূত মন-মানসিকতারও প্রতিফলন। তাদেরকে স্পষ্ট বলা দরকার যে, মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে তারা মৌলিক মানবাধিকারের অংশ মনে করে কি না ? যদি করে তাহলে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার। এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করা, নাক গলানো বাস্তবে মৌলিক মানবাধিকার লংঘনের শামিল। সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো জড়তা হীনমন্যতা থাকার কোনো সুযোগ নেই।

বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর কল্যাণ-অকল্যাণ নিয়ে যারা চিন্তাভাবনা করে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাদেরও এ বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।

ইসলামী শরীআ আইন মূলত মানবাধিকার সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। ইতিহাসের পাতা খুললেই একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে, যেখানেই ইসলামী শরীআ আইন কার্যকর করা হয়েছে, সেখানেই সত্যিকার অর্থে নিশ্চিত হয়েছে মানবাধিকার।

❐

www.pathagar.com

৫. ইসলাম সকল নবী-রাসূলের আদর্শ

ইসলাম কেবলমাত্র শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) উপস্থাপিত আদর্শই নয়। আদম (আ) থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত প্রেরিত সকল নবী-রাসূলগণই ইসলামের অনুসারী ছিলেন। সূরাতুল ফাতেহায় সিরাতুল মুস্তাকীমের প্রার্থনা প্রসঙ্গে আমরা যেসব আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্ত বান্দাদের পথে চলার কামনা-বাসনা পেশ করে থাকি, তাদের পরিচয় কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে নাবিয়্যীন-সিদ্দীকীন ও শুহাদা হিসাবে। অর্থাৎ মানুষের জীবন যাপনে আল্লাহ মনোনীত সহজ-সরল যে পথ 'সিরাতুল মুস্তাকীম' নামে পরিচিত, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাদের সার্থক অনুসারীগণ যারা সিদ্দীকীন এবং সালেহীন হিসাবে পরিচিত তারাও এ একই আদর্শের অনুসারী ছিলেন।

কুরআন শরীফে অতীতে যারা নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের কারো কারো ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। আর অনেকের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়নি। কুরআন শরীফে যেসব নবী-রাসূলের ইতিহাস প্রসঙ্গত আলোচনা করা হয়েছে তাঁদের সকলের মিশন ছিল এক ও অভিন্ন। দাওয়াত প্রদানের ভাষাও ছিল প্রায় এক ও অভিন্ন। সকল আসমানী কিতাব নাযিল ও নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন। আল্লাহ তাআলার ভাষায় ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ز

অর্থ ঃ "হে ঈমানদার লোকগণ! আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য নীতির উপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান হও এবং ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৮

এটা এজন্যে, যাতে মানব জাতি ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সূরায়ে হাদীদের এ আয়াতটি এ প্রসংগে আরো স্পষ্ট ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ

www.pathagar.com

بِالْقِسْطِ ج وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ○ ـ الحديد : ٢٥

অর্থ ঃ "আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হেদায়াতসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি, যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে এবং লোহাও অবতীর্ণ করেছি, ওতে বিরাট শক্তি এবং লোকদের জন্য বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটা এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যেন আল্লাহ তাআলা জানতে পারেন যে, কে তাঁকে না দেখেই তাঁর ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্য-সহযোগিতা করে। নিসন্দেহে আল্লাহ তাআলা বড়ই শক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫

সূরা আশ শূরায় বলা হয়েছে ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ○ ـ الشورى : ١٣

অর্থ ঃ "তিনি তোমাদের জন্য সেই দীনের নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মাদ!) এখন তোমার প্রতি আমার অহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি, আর যার হেদায়াত আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম এ তাকীদ সহকারে যে, কায়েম কর এ দীনকে এবং এ ব্যাপারে বিভক্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে যেও না। একথা এ মুশরিকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ হয়েছে যার দিকে (হে মুহাম্মাদ!) তুমি এ লোকদের দাওয়াত দিচ্ছো। আল্লাহ যাকে চান, আপন করে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন, যে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে।"–সূরা আশ শূরা ঃ ১৩

www.pathagar.com

এ আয়াতটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, হযরত নূহ (আ), ইবরাহীম (আ), মূসা (আ), ঈসা (আ) যে দীনের ধারক-বাহক ছিলেন, যে দীন কায়েমের জন্যে আদিষ্ট ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা) ও সেই দীনের ধারক-বাহক এবং সেই দীন কায়েমের জন্যে আদিষ্ট। বর্তমান বিশ্বে দুটি আসমানী গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলের ধারক-বাহক ইয়াহুদী ও খৃস্টধর্মের অনুসারীগণ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাদের আদি পিতা, আদি পুরুষ হিসাবে দাবী ও গর্ব করে থাকে। তাঁর সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, ইবরাহীম (আ) ইয়াহুদীও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না, তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মুসলিম। ঈসা (আ) প্রসঙ্গে কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ط فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ○ ـ الصف : ٦

অর্থ ঃ "আর স্মরণ কর মরিয়ম পুত্র ঈসার সে কথা, যা সে বলেছিল ঃ হে বনী ইসরাঈল ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর পাঠানো রাসূল, সত্যতা বিধানকারী সেই তাওরাতের, যা আমার পূর্বে এসেছে, আর সুসংবাদ দাতা এমন একজন রাসূলের যে আমার পরে আসবে, যার নাম হবে আহমাদ। কিন্তু কার্যত সে যখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন তারা বললো ঃ এটা তো সুস্পষ্ট প্রতারণা মাত্র।"–সূরা আস সাফ ঃ ৬

এ থেকে ঈসা (আ) কর্তৃক মূসা (আ)-এর উপরে নাযিলকৃত তাওরাতের সত্যায়ন ও স্বীকৃতির যেমন উল্লেখ পাওয়া যায়, তেমনি শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের শুভ সংবাদের ঘোষণা এতে রয়েছে।

সূরা আল আ'লার শেষ অংশে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى○ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى○ ـ الاعلى : ١٤-١٥

অর্থ ঃ "কল্যাণ লাভ করলো সেই ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করলো এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করলো, নামাযও পড়ল।"–সূরা আল আ'লা ঃ ১৪-১৫

www.pathagar.com

এটুকু বলার পর বলা হচ্ছে ঃ

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ○ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ○

অর্থ ঃ "পূর্বে অবতীর্ণ সহীফাসমূহেও একথাই বলা হয়েছিল— ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহেও।"–সূরা আল আ'লা ঃ ১৮-১৯

এর তাৎপর্য অনুধাবন করলেই আমরা বুঝতে পারি মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্যে আখিরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে দুনিয়ার জীবনকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন করার জন্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা মানব জাতির জন্যে সর্বশেষ যে হেদায়াত বা পথনির্দেশ দিয়েছেন তাওরাতে এবং অতীতের সকল আসমানী কিতাবে অনুরূপ পথনির্দেশের উল্লেখ ছিল। মূলত সকল নবী রাসূলের মিশনই ছিল এক ও অভিন্ন আর তাহলো ইসলাম। ইসলাম বাস্তবসম্মত আদর্শ। কুরআন মজীদে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমন প্রসঙ্গে একাধিক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○ ـ التوبة : ٣٣

অর্থ ঃ "তিনিই আল্লাহ, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াতের বিধান ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে সব দ্বীনের উপর জয়ী করে দেন ; মুশরিকদের পক্ষে তা যতই অসহ্য ব্যাপারই হোক না কেন।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩

সাধারণত দ্বীনে হকের অর্থ করা হয় সত্য দ্বীন হিসাবে। কিন্তু দ্বীনে হকের অনুবাদ সত্য দ্বীন হিসাবে করলে দ্বীনে হকের পূর্ণাঙ্গ অর্থ বহন করে না। হক আরবী শব্দ, যার অর্থ বাস্তবসম্মত। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা মানুষের জীবন যাপনের জন্যে, পথ চলার জন্যে যে বিধান দিয়েছেন তা মানব প্রকৃতির সাথে, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিশীল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশ্বপ্রকৃতি আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে যেমন স্বচ্ছন্দে পরিচালিত হচ্ছে অনুরূপভাবে মানুষের সমাজও আল্লাহর বিধান অনুসারে স্বচ্ছন্দে পরিচালিত হতে পারে।

www.pathagar.com

আল্লাহর বিধান লংঘন প্রাকৃতিক নিয়ম লংঘনেরই শামিল। মানুষের দেহ যন্ত্রটি আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক বিধান মেনে চলে। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে কাজ করলেই মানুষের দেহযন্ত্রটি স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। এর বিপরীত হাতের কাজ পা দিয়ে করা, পায়ের কাজ হাত দিয়ে করা, মুখের কাজ নাক দিয়ে করা মানুষের জন্যে যেমন কোনো অবস্থায়ই সুখকর হতে পারে না ; অনুরূপভাবে মানব সমাজের প্রথম ইউনিট পরিবার গঠনের জন্যে আল্লাহ যে বিধি-বিধান দিয়েছেন তা লংঘিত হলে কোনো পরিবার স্বচ্ছন্দে চলতে পারে না। রুজি-রোজগারের জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধের যে সীমারেখা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা লংঘিত হলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ আসতে পারে না। সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর হেফাযতের জন্যে, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানী, খুন-খারাবি, ধর্ষণ প্রভৃতি বন্ধ করার জন্যে আল্লাহ তাআলা যে শাস্তির বিধান ও বিচার ব্যবস্থা দিয়েছেন তা পাশ কাটিয়ে মানুষের সমাজে শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বর্তমান বিশ্বে প্রায় সর্বত্র যে অশান্তি, অনাচার-দুরাচার, পাপাচার, শোষণ-নিপীড়ন, নির্যাতনসহ ফেতনা-ফাসাদের দৌরাত্ম দেখা যায় তার মূল কারণ আল্লাহ প্রদত্ত স্বাভাবিক বিধানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং পাশ কাটানোর অনাকাঙ্ক্ষিত মন-মানসিকতা।

আল্লাহ তাআলার ভাষায় ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○ ـ الروم : ٤١

অর্থ ঃ "স্থল ভাগ ও জল ভাগে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে লোকদের নিজেদের কৃতকর্মের দরুন। যেন তাদেরকে তিনি তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করান। এর ফলে হয়তো তারা ফিরে আসবে।"–সূরা আর রূম ঃ ৪১

www.pathagar.com

৬. ইসলাম বাস্তবসম্মত জীবন বিধান

ইসলাম বাস্তব সম্মত এবং মানব প্রকৃতি ও সহজাত প্রবৃত্তির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান। এটা শুধু কথার কথা নয়, তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটা প্রকৃত পক্ষেই বাস্তবসম্মত। আল কুরআনে আল্লাহ ভাল কাজ, মন্দ কাজ এবং হালাল-হারাম বা বৈধ-অবৈধ কাজ প্রসঙ্গে যে কয়টি শব্দ ব্যবহার করেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভাল কাজ, নেক কাজ প্রসঙ্গে কুরআনে ব্যবহৃত শব্দটি হলো মা'রূফ যার শব্দার্থ পরিচিত। মানুষের বিবেকের কাছে যা ভাল হিসাবে বিবেচিত ও গ্রহণযোগ্য তাই মা'রূফ বা ভাল কাজ। এটা শুধু কথার কথা নয়, বাস্তবসম্মত সত্য কথা। মানুষের জন্য কল্যাণকর, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করা, মানুষের সাথে সৎ আচরণ করা, প্রত্যেকের অধিকার বা পাওনা যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য কাজগুলো সর্বযুগের সকল মানুষের কাছে ভাল কাজ হিসাবেই বিবেচিত হয়ে আসছে।

খারাপ কাজ বা অসৎকাজ প্রসঙ্গে কুরআনের শব্দ হলো মুনকার, যার শাব্দিক অর্থ অগ্রহণযোগ্য, প্রত্যাখ্যাত। মানুষের যে সমস্ত আচরণ আল্লাহ প্রদত্ত বিবেকের কাছে অগ্রহণযোগ্য সে পর্যায়ের সকল কাজকেই মন্দ কাজ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। মানব ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সর্বযুগের সর্বকালেই এটা প্রমাণিত। মিথ্যা বলা, চুরি করা, মানুষের অধিকার হরণ করা, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর ক্ষতি করা, মানুষের অসম্মান করা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি এ পর্যায়ের যাবতীয় কার্যক্রম সর্বযুগের সর্বকালের সকল মানুষের কাছেই নিন্দনীয় হয়ে আসছে। যারা এসব খারাপ কাজে নিমজ্জিত তারাও কখনো বলবে না এগুলো ভাল কাজ। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয়কে বৈধ করেছেন, হালাল ঘোষণা করেছেন সেসব বিষয়ের মূলসূত্র হলো তাইয়্যেবাত, পূত-পবিত্র, রুচিসম্মত—হালালের তালিকাভুক্ত যাবতীয় বিষয়ের কোনোটি অরুচিকর নয়। বরং মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হোক, বৈবাহিক, পারিবারিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

হোক, জীবন জীবিকার প্রয়োজনে পেশা গ্রহণের বিষয়ে হোক, আর খাদ্য তালিকায় হোক, সকল ক্ষেত্রেই বৈধ পেশা, মানুষের উপযোগী সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। এর বিপরীত যেগুলো হারাম করা হয়েছে সেগুলোর মূলসূত্র হিসাবে যে শব্দটি এসেছে তাহলো খাবীস বা খাবায়েস, যার অর্থ অপবিত্র ও কুরুচিকর। এটাও জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্যে উপরে বর্ণিত কথাগুলোর বিপরীত চিত্র তুলে ধরে। নারী পুরুষের মেলামেশার ক্ষেত্রেও বৈবাহিক জীবনের জন্যে আল্লাহর দেয়া সীমারেখা, ব্যবসা-বাণিজ্যে আল্লাহর অপছন্দনীয় লেন-দেন, আর জীবজন্তুসহ খাবারের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিষয়বস্তু সবকিছুকে এ আদলে বিচারযোগ্য।

ইসলামী জীবনাদর্শ বিশ্বের সব মানুষের জন্যে। মানব প্রকৃতির দুর্বলতা সবলতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আগত এ আদর্শ গ্রহণ করাটাই মানুষের জন্যে সবচেয়ে বেশী সহজসাধ্য ও বাস্তবসম্মত। মানুষের জন্যে দুঃসাধ্য কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর চাপিয়ে দেননি। দীনকে আল্লাহ তাআলা এতটাই সহজ করেছেন যা সর্বস্তরের গণমানুষের জন্যে অনুসরণ করা সহজসাধ্য। এ সম্পর্কে একটি হাদীসের বক্তব্য সামনে রাখতে পারি। আল্লাহর রাসূলের ব্যক্তিগত ইবাদাত বন্দেগী প্রসঙ্গে জানার জন্যে কতিপয় সাহাবী আল্লাহর রাসূলের (সা) বাসগৃহে গেলেন এবং রাসূল (সা)-এর সহধর্মীনীদের সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা জানতে পারেন তাঁর ঘর সংসার আছে, তিনি বিবি-বাচ্চাদেরকে সময় দেন। নফল ইবাদাত-বন্দেগীর দিক থেকে তিনি সারা রাত জাগরণ করেন না, কখনো জাগেন, কখনো বিশ্রাম করেন। সবদিন রোযা রাখেন না, কখনো কখনো রাখেন। তাদের কাছে নফল ইবাদাত বন্দেগীর বিষয়টা কম মনে হয়েছে। তিনি বিবি-বাচ্চাদেরকে সময় দেন এটা তাদের কাছে অবাক লেগেছে। এ ঘটনার সূত্র ধরে তারা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে কেউ সারা রাত জেগে নামায পড়ার ঘোষণা দেন, কেউ অবিরাম রোযা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন, কেউ আবার নারী সঙ্গ থেকে দূরে থাকার ঘোষণা দেন। ইতিমধ্যে রাসূল (স) আসার পথে তাদের কথোপকথন

www.pathagar.com

শুনতে পান এবং জানতে চান, তোমরা এসব বলাবলি করেছ নাকি ? তারা ইতিবাচক উত্তর দেয়ার পর রাসূল (স) বলেন, সেই আল্লাহর কসম যাঁর হাতে আমার জীবন। আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশী ভয় করি, আমি বিবি-বাচ্চাদের জন্যে, ঘর-সংসারের জন্যে সময় দেই। কখনো রাতে জাগি কখনো বিশ্রাম নেই। কখনো নফল রোযা রাখি কখনো রাখি না—এটাই আমার সুন্নত। যারা এটা ছাড়া অন্যটা করবে তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

যেহেতু ইসলাম সর্বসাধারণের জন্যে, সর্বস্তরের গণমানুষের জন্যে, গুটিকয়েক মানুষের জন্যে নয়, সেজন্য রাসূল (সা) তাঁর বাস্তব জীবনে এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

❐

www.pathagar.com

৭. ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার আদর্শ

ইসলামী আদর্শের মূল লক্ষ্য দুনিয়ার জীবনের শান্তি ও আখেরাতের জীবনে মুক্তি নিশ্চিত করা। আখেরাতে মুক্তির জন্যে দুনিয়ায় যে কাজ গুলো করতে হয়, তাও মানুষের সমাজে শান্তি-নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্যে। ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের দুটি অধিকার আদায় করতে হয়। একটি হলো আল্লাহর অধিকার (হাক্কুল্লাহ), আর একটি হলো মানুষের অধিকার (হাক্কুল ইবাদ)। দুটো মিলে পরিপূর্ণ ইসলাম। যেটাকে আমরা এভাবেও প্রকাশ করতে পারি, স্রষ্টার ইবাদাত এবং সৃষ্টির খেদমত। মূলত আল্লাহর অধিকার পূরণ করার বা আদায় করার অনিবার্য দাবী হলো বান্দার অধিকার আদায় করা। আমরা তাওহীদের আলোচনায় উল্লেখ করেছি, এর একটি দিক হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা, আর দ্বিতীয়টি হলো মানব জাতির ঐক্য-সংহতি ও সৌভ্রাতৃত্ব।

হাদীসে রাসূলের ভাষায় ঃ

كُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ وَاِخْوَانًا -

"তোমরা এক আল্লাহর দাস হয়ে যাও এবং হয়ে যাও একে অপরের ভাই।"

অতএব তাওহীদের সার্থক বাস্তবায়নের অনিবার্য দাবী হলো মানুষের সমাজে শান্তি-নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা। একটু আগে আমরা বলেছি, আল্লাহর অধিকার পূরণের বিষয়টি মানুষের অধিকার পূরণের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। হাদীসে রাসূলে আছে ঃ

আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাঁর বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আমাকে খাবার দাওনি কেন ? আমি বস্ত্রহীন ছিলাম আমাকে বস্ত্র দাওনি কেন ? আমি রুগ্ন ছিলাম আমার সেবা করনি কেন ? আল্লাহকে প্রশ্ন করে বান্দা জানতে চাইবে, তুমি তো আল্লাহ তোমাকে কি করে খাবার দেই, বস্ত্র দেই ? আল্লাহ বলবেন, আমার বান্দা ক্ষুধার্ত ছিল,

www.pathagar.com

তাকে খাবার দিলে সে হতো আমাকে খাওয়ানোর শামিল, আমার বান্দা বস্ত্রহীন ছিল তাকে বস্ত্র দিলে ওটা হতো আমাকে দেয়ার শামিল, আমার বান্দা রুগ্ন ছিল তাকে চিকিৎসা সহায়তা দিলে সেটা হতো আমার সেবার শামিল। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় বান্দার হক আদায় করা আল্লাহর হক বা অধিকার হিসাবেই আল্লাহর কাছে বিবেচিত।

রাহমানুর রাহীম আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত ইসলামের আদর্শ ভিত্তিক আইন-কানুন, বিধি-বিধান সবটার মূল লক্ষ্য মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং যাবতীয় অকল্যাণ ও ক্ষতিকর দিক থেকে মানুষের সমাজকে হেফাজত করা। বিশেষ করে মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিত করা হাক্কুল ইবাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। এর পাশাপাশি দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দিক হলো মানুষের জানমাল ও ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করা। সূরাতুল কুরাইশের শেষাংশের কথাগুলো প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ বলেন ঃ

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ○ الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ○

অর্থ ঃ "কাজেই তাদের কর্তব্য হলো এ ঘরের রবের ইবাদাত করা। যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে খেতে দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে বাঁচিয়ে নিরাপত্তা দান করেছেন।"–সূরা আল কুরাইশ ঃ ৩-৪

অর্থাৎ তাদের উচিত কা'বা-বায়তুল্লাহর রবের ইবাদাত বন্দেগী করা, যিনি ক্ষুধা ও ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা বিধান করেছেন। এ ক্ষেত্রে স্পষ্টত বুঝা যায় ইসলামী আদর্শই মানুষের মৌলিক চাহিদা ও মৌলিক অধিকারের একমাত্র রক্ষাকবচ। মানুষ দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে চায় মাথা গুজার একটু ঠাই, লজ্জা নিবারণের জন্যে প্রয়োজনীয় কাপড়, ক্ষুধা নিবারণের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্ন, শিক্ষা এবং রোগের চিকিৎসা। আর সেই সাথে চায় সকল প্রকারের ভয়-ভীতি থেকে তার জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর হেফাযতের নিশ্চয়তা। গোটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি দিক ও বিভাগেই রয়েছে মানুষের সকল অধিকারের বাস্তব প্রতিফলন। আমরা একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করেছি, নবী-রাসূলের আগমন ও আসমানী কিতাবের মূল লক্ষ্য মানুষের সমাজে প্রকৃত শান্তি

www.pathagar.com

কল্যাণ এবং ইনসাফ নিশ্চিত করা। শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমন সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন নাযিলের চূড়ান্ত লক্ষ্য এটাই। কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় যত মানুষ আসবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যে সামাজিক ন্যায় বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এর মূল লক্ষ্য ঃ

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ○- المائدة : ١٥

অর্থ ঃ "তোমাদের নিকট আল্লাহর কাছ থেকে রৌশনী এসেছে এবং একখানি সত্য প্রদর্শনকারী কিতাব।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১৫

এখানে আল্লাহ তাআলা যে কথাটি ঘোষণা করেছেন তাহলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি নবী এবং কিতাব এসেছে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জীবনের সকল দিক শান্তির পথে পরিচালিত করেন। অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। তাদেরকে সন্ধান দেন সত্য ও সঠিক পথের, যারা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ অনুসরণ করে চলে। এ আয়াত দুটির মধ্যে শেষ নবীর আগমন ও তাঁর উপর নাযিলকৃত কিতাবের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে সকল দিক ও বিভাগে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বিধান, একটি সহজ-সরল অথচ মজবুত, টেকসই জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা উপহার দেয়ার কথা বলেছেন। সূরা আল হজ্জে মুসলিম শাসকদের চারটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো ঃ নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎকাজের বাধা প্রদান। এগুলোর সফল বাস্তবায়ন হলে সর্বস্তরের জনমানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে বাধ্য। রাষ্ট্রীয়ভাবে যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নামায কায়েমের মাধ্যমে অধিকার সচেতন সৎ নাগরিক গড়ে উঠে। রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে ধনীর কাছ থেকে যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করে গরীবের মাঝে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পিতভাবে বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানের বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিলে গরীব জনসাধারণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার বিষয়টি স্বচ্ছন্দে পূরণ হতে পারে। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের বাধা দান মুসলিম শাসকদের এ দুটি মৌলিক দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। আমর বিল মা'রূফ, নাহী আনিল মুনকার কুরআনের দুটি মৌলিক পরিভাষা। যার তরজমা আমরা সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎকাজে বাধা দান হিসাবে করে থাকি, যা ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে। সূরা আন নাহলের ৯০ আয়াতের দিকে তাকালে আমরা এর পরিপূরক হিসাবে দেখতে পাই ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ ـ النحل : ٩٠

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা সুবিচার, ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের (সেলাহে রেহমীর) নির্দেশ দিচ্ছেন। এবং অন্যায়, পাপ, নির্লজ্জতা ও যুলুম অত্যাচার করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে নসীহত করছেন, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।"

–সূরা আন নাহল ঃ ৯০

এখানে যুগপৎভাবে আদেশ এবং নিষেধ সূচক বক্তব্য এসেছে। আদেশ পর্যায়ে তিনটি কাজ আদল, ইহ্সান এবং ইতায়িযিল কুরবা। এর মধ্যে মুখ্য বিষয় হলো, 'আদল' যার মূল দাবী হলো—যার যা পাওনা তাকে তা বুঝিয়ে দেয়া। যার যা প্রাপ্য তাকে কম দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ পাওনা প্রাপ্য বা অধিকার ব্যাপক অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এরপরে ইহ্সান শব্দটির সংযোজন প্রমাণ করে কাউকে পাওনার চেয়ে কম দেয়ার সুযোগ নেই, বরং তার চেয়ে একটু বেশী বেশী দেয়া আল্লাহ তাআলা পসন্দ করেন। সেই সাথে প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তিদের নিকটাত্মীয় এবং অভাব-অভিযোগ পূরণের ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইতিবাচক এ কাজ তিনটি কোনো সমাজে যথাযথভাবে সম্পাদন ও কার্যকর হলে সেখানে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এরপরও যাতে কোনো কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী একে নস্যাৎ করতে না পারে এজন্য তিনটি মৌলিক নেতিবাচক বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন।

www.pathagar.com

প্রথমটি হলো ঃ ফাহেশা বা লজ্জাহীনতা বা অশ্লীলতা। এক শ্রেণীর মানুষ লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতার প্রসার ঘটিয়ে মানুষের সহজাত সু-প্রবৃত্তি ধ্বংস করে কু-প্রবৃত্তির শক্তি যোগায়। যার অনিবার্য পরিণতিতে নানা সামাজিক অপরাধ সমাজের মানুষকে গ্রাস করে এবং পরিণামে মানুষের সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে। যা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যে ক্ষতিকর।

দ্বিতীয়টি হলো ঃ মুনকার বা যাবতীয় অনৈতিক কাজ, বিবেকের পরিপন্থী কাজ। ব্যাপক অর্থে যা মানুষের সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করে।

তৃতীয়টি হলো ঃ বাগয়িউন অর্থাৎ যুলুম বা সীমালংঘন। সার্বিকভাবে সকল প্রকারের সীমালংঘন, মানুষের অধিকার হরণের পর্যায়ের যাবতীয় অন্যায় অবিচারমূলক কাজ এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলার বিধান খুবই বাস্তব সম্মত। মানুষের সমাজে শান্তি, কল্যাণ, নিরাপত্তা ও সুবিচার সু-নিশ্চিত করার জন্যে যেমন ইতিবাচক তিনটি বিষয়ে অর্থাৎ আদল, ইহ্সান এবং ইতায়িযিল কুরবাকে নির্দিষ্ট করেছেন ; তেমনি শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী তিনটি কার্যক্রমের ব্যাপারে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। যাতে করে মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তাকে নিরর্থক বা হুমকি যুক্ত না করা যায়।

❐

www.pathagar.com

৮. শরীআ আইনের মূল লক্ষ্য

ইসলামের 'হুদূদে শরীআ' বা শরীআ ভিত্তিক দণ্ডবিধি আইনসমূহের লক্ষ্য মূলত ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের পবিত্রতা ও সামাজিক নিরাপত্তা তথা জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর হেফাযত, পবিত্রতা সংরক্ষণ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। মানব সমাজের প্রথম ইউনিট পরিবার, যার সূচনা হয় একটি নারী ও একটি পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম যৌতুক প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং স্ত্রীর জন্যে মোহরানা আদায় করা স্বামীর উপর বাধ্যতামূলক করেছে। এ মোহরানার অর্থ স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার বা পাওনা। স্ত্রীর ভরণ-পোষণসহ যাবতীয় দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপরে অর্পিত। স্ত্রীকে স্বামীর ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর যে অধিকার দেয়া হয়েছে স্ত্রীর উপার্জিত বা মালিকানাধীন ধন-সম্পদের উপরে স্বামীকে অনুরূপ অধিকার দেয়া হয়নি। এরপরও মহল বিশেষ নারী অধিকারের প্রশ্ন তুলে ইসলামের উপর কটাক্ষ করে থাকে যা কোনো বিচারেই যুক্তিসংগত হতে পারে না। অভিভাবকহীন, পিতা-মাতাহীন, ইয়াতিম ছেলেমেয়েদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজের উপর বর্তায়। এদের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিত্তবান লোক থাকলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ অসহায় অভিভাবকহীনদের দেখাশুনার দায়িত্ব বিত্তবানদের উপর অর্পণ করতে পারে। সেটা পালন করা হবে বাধ্যতামূলক। এমন কাউকে পাওয়া না গেলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ সরাসরি এদের ভরণ-পোষণ, লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

সমাজে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানী, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, অপহরণসহ পেশাদারী অপরাধ দমনের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত শরয়ী আইন বা বিচার ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। অথচ এ শরীআতী আইনকে মহল বিশেষ বর্বর যুগের আইন নামে আখ্যায়িত করে মানবাধিকার লংঘন হিসাবে চিহ্নিত করছে।

www.pathagar.com

অপরাধীকে শাস্তি দেয়াই ইসলামী বিধানের লক্ষ্য নয় বরং মূল লক্ষ্য হলো সমাজকে অপরাধ মুক্ত করা। মানুষ অপরাধ করতেই থাকবে আর রাষ্ট্র যথারীতি তাদের শাস্তি দিতে থাকবে এটা ইসলামের কাম্য নয়। ইসলামের কাম্য হলো সমাজে অপরাধসমূহের উৎস বা ছিদ্রপথ বন্ধ করা, যাতে অপরাধ সংঘটিত হতে না পারে। এরপরেও যদি কোনো দুষ্ট চক্র অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালাবার অপপ্রয়াস চালায়, কেবলমাত্র তাদের জন্যই কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে যাতে করে অপরাধ সম্প্রসারিত হতে না পারে।

সমাজে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি ঘটার প্রধান দুটি কারণের একটি হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার কারণে সৃষ্ট দারিদ্র ও বেকারত্ব। দ্বিতীয়টি নৈতিক অবক্ষয়। যার সূত্রপাত হয় প্রথমত হতাশা-নিরাশা থেকে এবং মাদকাসক্তি ও অবৈধ অস্ত্রের সহজলভ্যতার কারণে।

ইসলাম এহেন সামাজিক অপরাধের উৎস ও ছিদ্রপথ আগে বন্ধ করতে চায় সালাত কায়েম ও যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে। আমরা আগেই বলেছি, সালাত পূর্ণ নীতি-নৈতিকতার অধিকারী সৎ নাগরিক সৃষ্টি করে। আর যাকাত ব্যবস্থা ধনী-গরীবের আকাশ ছোঁয়া পার্থক্য এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা দূর করে, বঞ্চিত অভাবগ্রস্ত মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে। সমাজে খুন-খারাবি হত্যাকাণ্ড ঘটে খুনীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা কার্যকর না হওয়ার ফলে। তাছাড়া সমাজে সবার জন্যে আইনের শাসন সমানভাবে প্রযোজ্য না হওয়া এবং বিচার সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে হওয়া প্রভৃতি এর কারণ হিসাবে কাজ করে থাকে। সর্বোপরি নীতি-নৈতিকতা, মানবতা ও মনুষ্যত্বের পরিবর্তে মানুষের উপরে পশুত্ব এবং পাশবিকতার প্রভাবও এর একটি বড় কারণ। ইসলামের গোটা কার্যক্রম এসব কারণ দূর করার লক্ষ্যে পরিচালিত।

মানুষ হত্যা প্রসঙ্গে কুরআনের উক্তি, 'যে এক ব্যক্তিকে হত্যা করলো সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করলো।' এর অর্থ দাঁড়ায় একটি হত্যাকাণ্ডের যদি যথাযথ বিচার না হয় তাহলে আরো অনেক হত্যাকাণ্ডের রাস্তা খুলে যায়। অন্যান্য হত্যা রোধ করার জন্যে সুনির্দিষ্ট সাক্ষী

www.pathagar.com

প্রমাণসহ প্রমাণিত হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডই ন্যায় বিচারের দাবী। এজন্যে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

অর্থ ঃ "বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন হে মানুষ! কিসাসেই তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে, আশা করা যাচ্ছে যে, তোমরা এ আইন লংঘন থেকে বিরত থাকবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৯

নিসন্দেহে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের শাস্তি বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমস্ত মানুষের জীবন।

অনুরূপভাবে মানুষের রক্তের পবিত্রতার স্বার্থে ; ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ জীবনের শৃংখলা ও পবিত্রতার স্বার্থে আল্লাহ তাআলা যেনা-ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করেছেন। যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হতেও নিষেধ করেছেন। যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্যে কঠোর শাস্তি বিধানেরও ব্যবস্থা করেছেন।

আর এ শাস্তিবিধি কার্যকর ও প্রয়োগের আগে আল্লাহ তাআলা এসব অপরাধ সংঘটিত হওয়ার উৎস ও ছিদ্রপথগুলো বন্ধের ব্যবস্থা করেছেন। অশ্লীলতা, উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা, যৌন অপরাধ ও উচ্ছৃংখলতা সৃষ্টিকারী অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং এ ধরনের সকল কু-প্রবৃত্তি-জাত অভ্যাস ও আচরণ নিষেধ করেছেন। সমাজে বিবাহ সহজসাধ্য ও যেনা-ব্যভিচারকে অসাধ্য করে এমনি আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরপরও যদি কোনো পাষণ্ড মানুষ পশুত্ব ও পাশবিকতার পরিচয় দেয় এবং এসব অপরাধে লিপ্ত হয় তাদের জন্যে হুদূদে শরীআত কার্যকর করার কোনো বিকল্প নেই।

যারা এ আইনটিকে অসভ্য, বর্বর বলে অভিহিত করতে চায়, মানবতা মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে মানুষের সমাজে পশুত্ব ও পশুবৃত্তির প্রাধান্যই তাদের কাম্য। এখানে একটি জিনিস আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা কায়েম করা ছাড়া ইসলামের এ দণ্ডবিধিসমূহ কার্যকর করা সম্ভব নয়। আর এটা কার্যকর করার দায়িত্ব

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের বা তার অনুমোদিত বিচার বিভাগ বা আদালতের। কোনো ব্যক্তি অথবা প্রাইভেট সংস্থা আইন হাতে তুলে নিয়ে এ শরীআ আইন কার্যকর করতে পারে না। এর কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। দুনিয়ার কোথাও বিচ্ছিন্ন কোনো ভাবনার উপরে ভিত্তি করে আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল (সা) প্রদর্শিত মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করণের বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত এ জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে কটূক্তি ও বিভ্রান্তি ছড়াবার কোনো সুযোগ নেই। যুক্তিসংগত কারণেই বিশ্বব্যাপী মানুষের সমাজে জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তাহীনতা বেড়েই চলছে। মানুষের ব্যক্তি জীবনের হতাশা-নিরাশা, পারিবারিক জীবনে অশান্তি, সমাজ জীবনে নৈরাজ্য ক্রমে বেড়েই চলেছে। মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তিক উন্নতি-অগ্রগতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমৃদ্ধি যতই বিস্তার লাভ করুক না কেন প্রকৃতপক্ষে মানবতা-মনুষ্যত্বের দ্রুত অবনতি এবং অপরাধ বেড়েই চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে মানব সভ্যতা একটি মহা-বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। এ বিপর্যয় থেকে মানব সভ্যতার মুক্তি ও নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় হলো আসমান যমীনের স্রষ্টা, বিশ্বলোকের স্রষ্টা, গোটা মানব জাতির স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধানের দিকে ফিরে আসা। মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে এর অন্য কোনো বিকল্প নেই।

❐

www.pathagar.com

১. ইসলাম প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা

ইসলামী আদর্শের সুফল পাওয়ার জন্যে, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম কায়েম হওয়া অপরিহার্য। আজকের দিনে বিশ্বব্যাপী প্রায় দেড় শ'কোটি মুসলমান, ষাটের অধিক মুসলিম রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ এবং বিশ্ববাসী ইসলামের এ সুফল থেকে বঞ্চিত আছে। কারণ ইসলামী আদর্শ আজ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে শুধুমাত্র প্রচার প্রসার এবং উপদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এ অবস্থার ফলশ্রুতিতে মুসলিম উম্মাহ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গোটা মানব জাতি। তাই আজকের বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শুধু মুসলমানদের স্বার্থে নয় গোটা মানব জাতির স্বার্থেই ইসলামকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্য কথায় মানব জাতির স্বার্থেই ইসলাম কায়েমের জন্যে বিশ্বের দেশে দেশে মুসলিম উম্মাহকে এগিয়ে আসতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো ইসলাম কায়েম হবে কিভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে ? ইসলাম সত্যিকারভাবে কায়েম করতে হলে মুসলিম উম্মার করণীয় কী ? আমরা এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোকপাত করবো।

ইসলাম কায়েমের বিষয়টি মুসলমানদের জন্যে নতুন কোনো বিষয় নয়। ইসলাম বাস্তবে কায়েমের জন্যে শুধু আলোচনা ও প্রচারধর্মী কার্যক্রম তথা উপদেশ প্রদানই যথেষ্ট নয়। মানুষ আল্লাহর খলীফা হিসাবে দুনিয়ায় যে দায়িত্ব পালনের জন্যে এসেছে তার অনিবার্য দাবী হলো দীন কায়েম করা।

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) মানুষকে আল্লাহর খলীফা হিসাবে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করার জন্যে দীন কায়েমের আন্দোলনেরই নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বে এ পুস্তিকায় সূরা আশ শুয়ারার একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছি। এখানেও তার পুনঃ উল্লেখ করতে চাই।

www.pathagar.com

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ـ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ○ ـ الشورى : ١٣

অর্থ ঃ "তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মাদ!) এখন তোমার প্রতি আমরা অহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি, আর যার হেদায়াত আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম এ তাকীদ সহকারে যে, কায়েম কর এ দ্বীনকে এবং এ ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। একথা এ মুশরিকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ হয়েছে যার দিকে (হে মুহাম্মাদ!) তুমি এ লোকদের দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহ যাকে চান, আপন করে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন, যে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে।"

–সূরা আশ শূরা ঃ ১৩

এখানে নূহ (আ), ইবরাহীম (আ), মূসা (আ)-এর উল্লেখসহ শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি নির্দেশের ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ

অর্থাৎ "একমুখী হয়ে কায়েম করো এ দীনকে এবং এ ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

এ দ্বীন কায়েমের অর্থ দ্বীনী ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী করা, যার বাস্তব রূপায়ণ হলো দ্বীন ইসলাম পূর্ণাঙ্গ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র হবে এ আইনের অধীনে পরিচালিত। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) সকলেই এভাবে দ্বীন কায়েমের জন্যে আদিষ্ট ছিলেন। শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে কায়েমের মাধ্যমে তাঁর রেসালাতের দায়িত্ব শেষ করেছেন এবং পরবর্তীতে কেয়ামত পর্যন্ত দ্বীন

www.pathagar.com

কায়েম রাখার দায়িত্ব তাঁর উম্মতের উপর অর্পণ করে গেছেন। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ)-এর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মৌলিক কাজ ছিল মানব সমাজের সকল অশান্তি, অবিচার ও দুর্ভোগ থেকে মুক্তির জন্যে আল্লাহর বন্দেগী তথা আল্লাহর গোলামী ও দাসত্ব কবুল করা এবং গায়রুল্লাহ তথা তাগুতি, খোদাদ্রোহী শক্তির কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার আহ্বান জানানো। এ আহ্বানের ভাষায় সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও মূল সুর ছিল এক ও অভিন্ন। মানুষের সমাজে অর্থবহ পরিবর্তন আনার এ দাওয়াত একটি সুদূর প্রসারি বিপ্লবী আহ্বান। আজকে সারা বিশ্ববাসীর দুর্দশা-দুর্ভোগের চিত্রকে সামনে রেখে ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপনের একটি উপযুক্ত সময় এসেছে বলে আমি মনে করি। আপাত-পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল ভয়াবহ মনে হোক না কেন শান্তি ও নিরাপত্তাকামী মানুষের জন্যে ইসলামের দিকে ফিরে আসা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। প্রয়োজন শুধু মুসলমানদের বিষয়টি যথাযথ উপলব্ধি করে দা'য়ী হিসাবে আপোষহীন ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসা।

❐

www.pathagar.com

২. ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি

ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গোটা মুসলিম উম্মাহর। বিশেষ করে উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও গোটা আলেম সমাজের। দ্বীন কায়েমের জন্যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী কৌশল অবলম্বনে কোনো বাধা নেই। তবে তা অবশ্যই কুরআন সুন্নাহর মূলনীতির পরিপন্থী হওয়া চলবে না। দ্বীন কায়েমের জন্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) গৃহীত পদ্ধতি ও কৌশলকে মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে সমসাময়িক বিশ্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। রাসূল (সা)-এর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জিন্দেগীর কর্মধারা ও কর্মকৌশল স্টাডি করলে মৌলিকভাবে দুটি জিনিস আমাদের সামনে আসে। মাক্কী জিন্দেগীর ১৩ বছরে ব্যতিক্রমী চরিত্রের অধিকারী একদল মানুষ তৈরীর ব্যাপারে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আর মদীনাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের ভিত্তিতে মক্কায় তৈরী করা লোকদের নিয়ে মদীনায় গিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ গড়েছেন। লক্ষণীয়, মক্কা রাসূল (সা)-এর জন্মস্থান ছিল। মক্কার কুরাইশগণ ছিল সমস্ত আরব জনগণের কাছে সম্মানিত ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী। এ মক্কাতেই প্রথম অহী নাযিল হয়। মক্কাকেই কা'বা বায়তুল্লাহর অস্তিত্ব। মক্কাতেই কর্মস্থল হিসাবে গ্রহণ করে আল্লাহর রাসূল দীর্ঘ ১৩ বছর লাগাতার দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু মক্কায় প্রথমে দ্বীন বিজয়ী না হয়ে মক্কা থেকে অনেক দূরে মদীনায় প্রথম ইসলাম বিজয়ী হলো এবং ইসলামী রাষ্ট্র সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো। এমনটি কেন হলো ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর কাছে গ্রহণযোগ্য বাস্তবসম্মত শর্ত দুটি। এক ঃ একদল লোক তৈরী হতে হবে। যারা যুগপৎভাবে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার অধিকারী হবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র প্রশাসন পরিচালনার উপযোগী যোগ্যতা দক্ষতারও অধিকারী হবে। দুই ঃ জনগণের মধ্যে দ্বীনের ভিত্তিতে ভাগ্য পরিবর্তনের স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষাও থাকতে হবে।

মক্কায় প্রথম শর্তটি পূরণ হলেও মক্কাবাসী এর ভিত্তিতে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়নি। পক্ষান্তরে মক্কা

www.pathagar.com

থেকে দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও মদীনাবাসীর সমর্থনপুষ্ট নেতৃবৃন্দ নিজেরা স্বেচ্ছায় মক্কায় এসে আল্লাহর রাসূলের (সা) দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং তাকে মক্কা থেকে মদীনায় যাওয়ার অনুরোধ করেন। ইতিহাস সাক্ষী আল্লাহর রাসূল (সা) কোনো সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে মদীনা বিজয় করেননি। বরং মদীনাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনই ছিল বিজয়ের কারণ। মদীনাবাসীরাই মদীনায় ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠার মূল কারণ। এটাই ইসলাম কায়েমের স্বাভাবিক পদ্ধতি, যা রাসূল (সা) গ্রহণ করেছেন। অতএব দ্বীন কায়েমের সুন্নত তরীকা এটাই। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-সংশয় বা বিতর্কের অবকাশ নেই। দ্বীনকে বিজয়ী করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সাথে প্রধান যে শর্তটি দেয়া হয়েছে তাহলো ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِيْنَ ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَايُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে তেমনভাবে যমীনে খলীফা বানাবেন, যেমনভাবে তাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের বানিয়েছিলেন। তাদের জন্য তাদের এ দ্বীনকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেবেন যা আল্লাহ তাদের জন্য পসন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তামূলক অবস্থায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তখন তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকেও শরীক করবে না। অতপর যারা কুফরী করবে তারাই আসলে ফাসেক লোক।"

–সূরা আন নূর ঃ ৫৫

এখানে দ্বীনের বিজয়ের জন্যে একদল ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য মানুষ তৈরী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর সাথে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে

www.pathagar.com

মানুষকে সাহায্য করার চিরন্তন নীতি প্রসঙ্গে নাযিলকৃত আয়াতটিকে যোগ করতে হবে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءً فَلَا مَرَدَّلَهٗ ج وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ○

অর্থ ঃ "প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির লোকেরা নিজেদের অবস্থা বা গুণাবলীর পরিবর্তন না করে। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতির অকল্যাণ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তা কারো প্রতিবাদে রুদ্ধ হয়ে যায় না। মূলত আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোনো সাহায্যকারী নেই।"

–সূরা আর রা'দ ঃ ১১

কোনো জাতি নিজে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে উদ্যোগী না হলে আল্লাহ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না। একদিকে আল কুরআনের নির্দেশনা অপরদিকে শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) গৃহীত পদ্ধতি এ দুয়ের ভিত্তিতে আজকের প্রেক্ষাপটে দীন কায়েমের জন্যে যুগপৎভাবে সমাজ জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত অসৎ, অযোগ্য, খোদাদ্রোহী নেতৃত্বের বিকল্প হিসাবে জনগণের কাছে আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য একদল মানুষ তৈরীর কাজকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যেতে হবে। তার পাশাপাশি ব্যাপক ও কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলাকে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের একমাত্র উপায় —এ চিন্তা-চেতনায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ইসলামের পক্ষে সজাগ, সচেতন, সক্রিয় ও প্রবল জনমত সৃষ্টির জন্যে কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির পরিপন্থী নয় এমন আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সকল মাধ্যমই গ্রহণ করা যেতে পারে। এ গণআকাঙ্ক্ষার প্রকাশ আধুনিক বিশ্বের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নির্বাচনের মাধ্যমেও হতে পারে। নির্বাচন পদ্ধতি যেসব স্থানে অনুপস্থিত সেখানে এ কাজ নিরস্ত্র জনতার অহিংস গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হতে পারে। বলপ্রয়োগ বা সশস্ত্র কোনো কার্যক্রম দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। আল কুরআনে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে,

www.pathagar.com

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পরে, আগে নয়। একমাত্র রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রণে সুশৃংখল বাহিনী ছাড়া কারো হাতে অস্ত্র তুলে দেয়ার, সশস্ত্র অভিযান চালাবার কোনো কার্যক্রম ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে সমাজ থেকে ফেতনা-ফাসাদ দূর করার জন্যে, যা কেবল রাষ্ট্রশক্তির অধীনে এবং নিয়ন্ত্রণেই সম্ভব। এর বাইরে যে কোনো তৎপরতা ফেতনা-ফাসাদ কেবল বৃদ্ধিই করতে পারে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড শুধু আত্মঘাতিই নয়, বরং ইসলামের ভাবমর্যাদাও ক্ষুণ্ন করে এবং কেবল ইসলামের দুশমনদেরই শক্তি যোগায়। ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করার জন্য তাদের জন্যে খোঁড়া অজুহাত সৃষ্টির সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের উপরে আঘাত হানার জন্যে মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামের ঐতিহাসিকভাবে চিহ্নিত শত্রু পক্ষের কৌশলের এটা একটা অংশ। ইসলাম কায়েমে আগ্রহী সর্বস্তরের জন-মানুষকে বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও আলেম সমাজকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ, সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে।

❐

www.pathagar.com

৩. ইসলাম কায়েমের পয়লা ক্ষেত্র স্বদেশ

ইসলাম এসেছে সারা দুনিয়ার জন্যে। কিন্তু ইসলাম এক যোগে এক সাথে সারা বিশ্বে কায়েম হয়নি। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্বদেশ বা জন্মভূমিকে প্রথম ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সেখানে কাজ অব্যাহত রাখেন। হিজরতের নির্দেশ আসার পরে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের ফলশ্রুতিতে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার, প্রসার, প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং আজকের প্রেক্ষাপটে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমানদেরকে নিজ নিজ জন্মভূমি বা দেশে ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করতে হবে।

নিজের দেশে ইসলাম কায়েমের মাধ্যমে ইসলামের কল্যাণকর দিকগুলোর বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমেই বিশ্ববাসীকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। বাস্তবেই যদি কোথাও ইসলামী আদর্শের সফল প্রয়োগের ফলে মানুষের ভাগ্য খুলে যায়, আর্থ-সামাজিক উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হয়, মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, তাহলে দুনিয়াব্যাপী অতীতের যে কোনো সমাজের তুলনায় বর্তমান বিশ্বে ইসলামের প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করাটা খুবই সহজসাধ্য। শর্ত হলো ইসলামের সামাজিক ন্যায়বিচারসহ সার্বিক আদর্শের সফল বাস্তবায়নের জীবন্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে সক্ষম হওয়া। আল কুরআনে মুসলিম উম্মাহর পরিচয় দেয়া হয়েছে উম্মাতে ওয়াসাত এবং খায়রা উম্মাত হিসাবে।

এ পরিচয়ের বাস্তব প্রতিফলন একমাত্র তখনি সম্ভব যখন মুসলমানদের কোনো দেশ সত্যিকার অর্থে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী হিসাবে পরিচালিত হয়। খায়রা উম্মাতের কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

www.pathagar.com

وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

অর্থ ঃ "এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্যে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চলো। আহলি কিতাবগণ ঈমান আনলে তবে তা তাদেরই পক্ষে কল্যাণকর হতো, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায় ; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

আর উম্মাতে ওয়াসাত হিসাবে মুসলমানদের কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا○ ـ

অর্থ ঃ "আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্য পন্থানুসারী উম্মত বানিয়েছি, যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্যে সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন সাক্ষী হয় তোমাদের উপর।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩

এ দুটি পরিচয়ের অনিবার্য দাবী অনুযায়ী মানুষের কল্যাণ করতে হবে, মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাতে হবে। অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে হবে, বাধা দিতে হবে। আর সবটাই করতে হবে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে, শুধু মুখের কথায় নয়।

কোনো কোনো মহল মনে করে বিভিন্ন দেশের ভৌগলিক সীমারেখা মেনে নিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করা সঠিক পদ্ধতি নয়। তাদের দাবী কৃত্রিম মানচিত্র অস্বীকার করে বিশ্বব্যাপী খেলাফত প্রতিষ্ঠার ডাক দিতে হবে। একজনকে মুসলিম বিশ্বের খলীফা মানতে হবে। যারা এ মতের অনুসারী ও প্রবক্তা তাদের কাছে এভাবে বি ব্যাপী খেলাফত প্রতিষ্ঠার বাস্তবসম্মত বা সুস্পষ্ট কোনো

www.pathagar.com

কর্মসূচি আছে বলে জানা যায়নি। তেমনি এক ব্যক্তিকে খলীফা হিসাবে গোটা দুনিয়ার মুসলিম উম্মাহ গ্রহণ করবে কিনা এ প্রশ্নের কোনো উত্তরও তাদের কাছে নেই। তারা বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের মূলধারার অনুসৃত গণতন্ত্রের পদ্ধতি সম্পর্কে ঢালাওভাবে বিভ্রান্তি ছড়াবার নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে তাদের শ্রম ও মেধা ব্যয় করে চলেছে বলে পরিলক্ষিত হয়। এটা চলমান বিশ্বের পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আন্দোলনের মূল ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির নেতিবাচক কর্মকাণ্ড ছাড়া বাস্তবে ইতিবাচক দেয়ার মত কিছু নয়।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে হারাম বলার ফলশ্রুতিতে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ সৃষ্টি হয় যে, আসলে তারা কি চায়? এ ধরনের নেতিবাচক, বাস্তববর্জিত তাত্ত্বিক বক্তব্য ইসলামের জাগরণ বিরোধী মহলকে শক্তি যোগায়। ইসলামের পক্ষের শক্তির ব্যাপারে নানা কাল্পনিক তথ্য প্রবাহের উপাদান সরবরাহ করে যা চূড়ান্ত বিচারে উম্মাহর জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর হতে বাধ্য।

আধুনিক বিশ্বে জাতি রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্য থেকেই মুসলমানদেরকে স্ব-স্ব দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করতে হবে। কৃত্রিম উপায়ে রাতারাতি তড়িঘড়ি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা বাস্তবসম্মত নয়। রাসূলে পাক (সা) ২৩ বছরের নুবওয়াতী জিন্দেগীর পর্যায়ক্রমিক কর্মধারা সামনে রেখে তার সফল, সার্থক অনুসরণ ও বাস্তবায়নের দীর্ঘ মেয়াদী সংগ্রাম সাধনার কোনো বিকল্প নেই। এ সংগ্রাম সাধনায় যুগপৎভাবে দুটি বিষয়কে সমান্তরাল গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। একটি হলো প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের পরিবর্তে জনগণের আস্থাভাজন, সৎ ও যোগ্য লোকদেরকে বিকল্প নেতৃত্ব হিসাবে উপস্থাপন। আর দ্বিতীয়তঃ ব্যাপক গণসংযোগ ও প্রচারধর্মী কার্যক্রমের মাধ্যমে বলিষ্ঠ সক্রিয় জনমত সংগঠিত করণ। নেতৃত্বের প্রশ্নে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলেম ও অআলেমের বিভাজনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যা বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে মোটেই বাস্তবসম্মত নয়। বরং সময়ের দাবী হলো দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের মাঝে ঔপনিবেশিক শাসকদের সৃষ্ট বিভেদের প্রাচীর ভেঙে

www.pathagar.com

ফেলতে হবে। আলেমে দ্বীন ও আধুনিক শিক্ষিতদেরকে পরস্পরের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করতে হবে। এখনো আমাদের রাষ্ট্র ও প্রশাসন কেন্দ্রসমূহের নিয়ন্ত্রণ আধুনিক শিক্ষিত লোকদের হাতে। তাদেরকে উপেক্ষা করে বা তাদেরকে স্থায়ী প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়ে রেখে ইসলাম কায়েমের চিন্তা-ভাবনা কিছুতেই বাস্তবসম্মত হতে পারে না। আধুনিক শিক্ষিতদেরকে ইসলামের পক্ষে আনার জন্যে, ইসলামের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করার জন্যে আলেম সমাজকেই উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।

❐

www.pathagar.com

৪. ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদ

যে কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, আন্দোলন ও সংগ্রাম অপরিহার্য। ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে এর বিকল্প নেই। এ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও আন্দোলনের কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ জিহাদ।

কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لا مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ج فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰكُمْ ج فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

অর্থ ঃ "আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্যে বাছাই করে নিয়েছেন। আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছিলেন, আর এতে (কুরআনে)ও (তোমাদের এ নাম), যেন রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী হয়, তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত মানুষের জন্যে। অতএব নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মওলা-মুনীব। তিনি বড়ই উত্তম মওলা, বড়ই উত্তম সাহায্যকারী।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৮

এখানে আল্লাহর পথে চূড়ান্ত সংগ্রাম সাধনার জন্যে ডাক দেয়া হয়েছে নির্দেশ আকারে। বলা হয়েছে, এ কাজটির জন্যে মানুষের মধ্য থেকে তোমাদেরকে বাছাই করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা দ্বীনের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা ও জটিলতাকে স্থান দেননি। এ দ্বীন তোমাদের আদি পিতা

www.pathagar.com

ইবরাহীম (আ)-এর আদর্শ। এ আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্যে আল্লাহ যেমন তোমাদেরকে বাছাই করেছেন তেমনি তোমাদের আগে ও পরে এ আদর্শের অনুসারীদের নাম রেখেছেন মুসলিম, যাতে করে রাসূল হন তোমাদের জন্যে আদর্শ, সত্যের সাক্ষ্যদাতা আর তোমরা হতে পারো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যে অনুসরণীয় আদর্শ ও সত্যের সাক্ষ্যদাতা। নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোল। তিনি তোমাদের প্রভু, অভিভাবক। কতইনা উত্তম সেই অভিভাবক, কতইনা উত্তম সেই সাহায্যকারী। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ○ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط

অর্থ ঃ "হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, আমি কি তোমাদেরকে সে ব্যবসার কথা বলবো যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে ? তাহলো তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, আর আল্লাহর পথে জিহাদ করো তোমাদের জান-মাল দিয়ে।"–সূরা আস সাফ ঃ ১০-১১

❐

www.pathagar.com

৫. জিহাদের সঠিক তাৎপর্য

কুরআনে বর্ণিত এ জিহাদ শব্দটির অর্থ কেবলমাত্র যুদ্ধ নয়। যুদ্ধ এর একটি স্তর বা পর্যায় মাত্র। কিন্তু অনেকেই জিহাদ মানেই যুদ্ধ বুঝেন এবং বুঝিয়ে থাকেন। জিহাদ শব্দটির মূল ধাতু (جهد) জুহদুন। যার অর্থ চূড়ান্ত বা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো। এটা কুরআনের এক নিজস্ব পরিভাষা। যার যথার্থ অর্থ হলো আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর যমীনে ও মানুষের জীবনে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্যে চূড়ান্ত ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো। মালের ও জানের কুরবানীর বিনিময়ে সংগ্রামের মূল লক্ষ্য হবে আখেরাতের কঠিন ভয়াবহ শাস্তি থেকে নাজাত ও মুক্তি এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি।

উপরে উল্লিখিত আয়াত দুটির একটিতে বলা হয়েছে ঃ

وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ –

অর্থ ঃ "আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ও নিজেদের জান-প্রাণ দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জান।"–সূরা আস সাফ ঃ ১১

এ আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো, এ প্রচেষ্টায় কোনো ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থের কোনো লেশমাত্র থাকে না। এ প্রচেষ্টা পরিচালিত হবে পরিপূর্ণ ও নির্ভেজালভাবে আল্লাহর পথে, আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহকে রাজী-খুশি করার জন্যে। আল্লাহর মনোনীত পথ ও প্রক্রিয়া কি তা তিনি স্বয়ং মানবজাতিকে অবহিত করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে। সকল নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষার আলোকে অভিন্ন যে পথের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলো মানবজাতিকে মানুষের দাসত্ব ও গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামীর সুযোগ করে দেয়া। আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামীর পথে পরিচালিত করার কাজটিই হলো আল্লাহকে রাজী-খুশি

www.pathagar.com

করার একমাত্র স্বীকৃত ও অনুমোদিত উপায়। এ লক্ষ্যে পরিচালিত সার্বিক প্রচেষ্টা ও কার্যক্রমই জিহাদ নামে অভিহিত। যার সূচনা হয় দাওয়াত ইলাল্লাহর মাধ্যমে। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ)-এর দাওয়াতের ভাষা লক্ষ্যণীয় ঃ

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ۔

অর্থ ঃ "আল্লাহর বন্দেগী কর, তোমাদের জন্যে তিনি ছাড়া অন্য কেউ মাবুদ নেই।"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৩২

অর্থাৎ আল্লাহর দাসত্ব, গোলামী, বন্দেগী কর আর আল্লাহর গোলামী বন্দেগী থেকে মানবজাতিকে যারা বাধা প্রদান করে, মানুষের উপর নিজেদের দাসত্ব চাপিয়ে দেয় তাদেরকে বর্জন কর, প্রত্যাখ্যান কর।

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط

অর্থ ঃ "সে বললো, হে আমার জাতির লোকেরা ! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।"

–সূরা হূদ ঃ ৬১

আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী করা এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আইনদাতা বিধানদাতা নেই, নেই এমন কোনো সত্তা যার দাসত্ব করা যায়—এ দাওয়াত মূলত জিহাদের ঘোষণা বা একটি পরিপূর্ণ বিপ্লবের আহ্বান। এ আহ্বানের অন্তর্নিহিত দাবী হলো মানুষের সমাজ জীবনকে প্রতিষ্ঠিত খোদাহীন সভ্যতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে সর্বত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনমানুষের কল্যাণ ও যাবতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আম্বিয়ায়ে কেরাম যে ভাষায় দাওয়াত দিয়েছেন তাতে কোনো জঙ্গীভাব বা তথাকথিত মিলিটেন্সীর কোনো গন্ধ পাওয়া যায় না। তারা দরদভরা মন নিয়ে খোদাহীন সভ্যতার ফলশ্রুতিতে মানুষের সমাজে চলমান অশান্তি, অনাচার, দুরাচার, পাপাচার, শোষণ, নিপীড়ন ও দুর্ভোগ নিরসনের একমাত্র উপায় হিসাবে মহান আল্লাহর পথে ফিরে আসার আহ্বান রেখেছেন। এ আহ্বান তাঁরা যেমন রেখেছেন সমাজের উপর তলার মানুষের কাছে তেমনি সাধারণ মানুষের কাছেও।

www.pathagar.com

তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও জাতির সামনে তাদের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী, দরদী বন্ধু, শান্তি ও নিরাপত্তাকামী, বিশ্বস্ত, সৎ উপদেশ দানকারী হিসাবে হাজির হয়েছেন। নিরস্ত্র ও অহিংস ব্যক্তিদের এ আহ্বানটিও সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী বরদাশত করতে পারেনি। কারণ এ আহ্বানের মধ্যে মানব সমাজের একটি আমূল পরিবর্তনের স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নুবওয়াতি জিন্দেগীর মক্কী অধ্যায়ের ১৩টি বছর এর সাক্ষী যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে তৎকালীন সমাজের মানুষের দুর্দশা-দুর্গতি থেকে মুক্তির জন্যে অতীতের নবী-রাসূলদের আদলেই গায়রুল্লাহর গোলামী-বন্দেগী পরিহার করে এক আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগীর আহ্বান পেশ করেছেন। তাতে কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠীর প্রতি কোনো আক্রোশ-বিদ্বেষের লেশমাত্র ছিল না, ছিল না কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আভাস, ইংগিত। এতদসত্ত্বেও তার আপনজন আবু জাহল, আবু লাহাব এ আহ্বান অংকুরে নির্মূল করার জন্যে সর্বাত্মক বাধা-প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে বেছে নেয় অকথ্য যুলুম নির্যাতনের পথ। দীর্ঘ ১৩ বছর এ যুলুম-নির্যাতনের মুকাবেলায় আল্লাহর রাসূল কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন বা প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দিয়েছেন ইতিহাসে এরূপ ঘটনার কোনো অস্তিত্ব নেই। আল্লাহর রাসূলের সাথী-সঙ্গীগণ কাফের-মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে যখন এ ভাষায় ফরিয়াদ করেছেন, "আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন ? আপনি কি দোয়া করতে পারেন না ? আর কতকাল আমাদের এরূপ যুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে হবে ?" আল্লাহর রাসূল তাদের সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, "এ দ্বীন এক সময়ে বিজয়ী হবেই এবং তখন তোমরা দেখবে সানা' থেকে সুদূর হাদরা মাউত পর্যন্ত একজন রমণী একাকী সফর করছে অথচ তার রূপ-যৌবন বা ধন-সম্পদের প্রতি কারো দৃষ্টি যাবে না। কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়ো করছো।"

ইতোপূর্বে আলোচনায় এসেছে, জিহাদের সূচনা হয় বা কাজ শুরু হয় পূর্ণাঙ্গ দাওয়াতের মাধ্যমে। এ দাওয়াতের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট প্রতিকূল

www.pathagar.com

পরিবেশে দাওয়াত প্রদানকারীগণ ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে দাওয়াত অব্যাহত রাখার সাথে সাথে দাওয়াতের বাস্তব ও জীবন্ত নমুনা হিসাবে নিজেদের উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। যা ইসলামী পরিভাষায় শাহাদাত নামে অভিহিত। শাহাদাতের একটি চূড়ান্ত পর্যায় হলো দাওয়াতের উপস্থাপিত আদর্শের উপর যে কোনো পরিস্থিতিতে অটল, অবিচল ও আপোষহীন থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা। অর্থাৎ জীবনের ভয়-ভীতি উপেক্ষা করেও দাওয়াতে উপস্থাপিত আদর্শের যথাযথ ও সত্যতার সাক্ষ্য রেখে যাওয়া। শুধু যুদ্ধের ময়দানে জীবন দেয়াকেই শাহাদাত মনে করা হয়, সেটা হলো শাহাদাতের চূড়ান্ত পর্যায়। মূল শাহাদাতের অর্থ দ্বীনে হকের সত্যতা ও যথার্থতার প্রমাণ উপস্থাপন করা, কথার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে, ব্যতিক্রমধর্মী উন্নত নৈতিক চরিত্রের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাবার মাধ্যমে। এভাবে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান জিহাদের একটি অংশ, একটি পর্যায়। আর এটা দাওয়াতেরই অনিবার্য দাবী।

❐

www.pathagar.com

৬. জিহাদ, যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জিহাদ মানে যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ জিহাদের একটি অধ্যায় বা পর্যায় মাত্র। দাওয়াত ও শাহাদাতের পর্যায় শেষে দ্বীনের বিজয়ের একটি পর্যায়ে রাষ্ট্রশক্তি অর্জিত হওয়ার পরেই শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাথী সঙ্গীদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, মক্কায় তের বছর দাওয়াতের এবং শাহাদাতে হকের পর্যায় অতিক্রম শেষে আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর রাসূল (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে এসে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। এ নব গঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনা লগ্নেই একে মিটিয়ে দেয়ার জন্য ঐ আবু জাহল, আবু লাহাবদের গোষ্ঠী রাসূল (সা) ও তাঁর সাথীদের উপর যুদ্ধের পর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে ভাষায় যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ○ الَّذِيْنَ
اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ
النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا
اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ط وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○ اَلَّذِيْنَ
اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

অর্থ ঃ "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকেও অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা তারা নির্যাতিত। আল্লাহ নিশ্চিতই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। এরা সে লোক, যারা নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে। অপরাধ ছিল শুধু এতটুকু যে, তারা বলছে ঃ আমাদের রব তো আল্লাহ ! আল্লাহ যদি একদলকে অপর

www.pathagar.com

দলের দ্বারা প্রতিরোধ করতে না থাকতেন তাহলে খানকাসমূহ, গীর্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে প্রচুরভাবে আল্লাহর যিকির করা হয়—সবই চুরমার করে দেয়া হতো। আল্লাহ অবশ্যই সে লোকদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। বস্তুত আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী এবং অতিশয় প্রবল। এরা সেসব লোক, তাদেরকে আমরা যদি যমীনে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, নেকীর হুকুম দিবে এবং মন্দের নিষেধ করবে। আর সব ব্যাপারে চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩৯-৪১

এখানে লক্ষ্যণীয়, যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেহেতু এরা চরম যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছে, নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত হয়েছে, শুধুমাত্র আল্লাহকে রব হিসাবে ঘোষণা দেয়ার অপরাধে। আরো বলা হয়েছে, কিছু মানুষ দ্বারা কিছু মানুষকে দমন করার ব্যবস্থা না হলে দুনিয়াতে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের উপাসনালয়, মসজিদ প্রভৃতি ধ্বংস হয়ে যেত। সব শেষে বলা হয়েছে যাদের জন্যে এ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তারা দুনিয়ার কোথাও রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী হলে নিজেদের কর্তৃত্ব-ক্ষমতা-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, আর মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে, সকল কাজের চূড়ান্ত প্রতিদান প্রতিফল আল্লাহর হাতে। এ যুদ্ধের অনুমতি মানুষের উপরে যুলুম নির্যাতন বন্ধের জন্যে, মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্যে, মানুষের ধর্মীয় অধিকার সহ সকল অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে শান্তি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে ও সরাসরি যালেমের যুলুম থেকে মযলুম জনগোষ্ঠীকে মুক্তি দেয়ার জন্যে, পশুত্ব ও পাশবিকতার অবসান ঘটিয়ে মানবতা মনুষ্যত্বের বিকাশের মাধ্যমে মানুষের জানমাল ও ইয্যত-আবরু হেফাযতের কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে। এ যুদ্ধের যথার্থতা সম্পর্কে আল্লাহর এ বাণী প্রণিধানযোগ্য ঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج

www.pathagar.com

وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ج وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا○

অর্থ ঃ "কি কারণ থাকতে পারে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেসব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করবে না, যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপীড়িত হচ্ছে এবং ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এ জনপদ থেকে আমাদের বের করে নাও, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী এবং তোমার নিজের নিকট থেকে আমাদের কোনো বন্ধু, দরদী ও সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে 'তাগুতের' পথে। অতএব তোমরা শয়তানের সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো ; নিসন্দেহে বিশ্বাস করো যে, শয়তানের ষড়যন্ত্র আসলেই অত্যন্ত দুর্বল।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৭৫-৭৬

এখানে নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মযলুম জনগোষ্ঠীর আর্তচিৎকারে সাড়া দেয়ার জন্যেই আল্লাহ তাআলা জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায় এ যুদ্ধের বিষয়টিকে যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হিসাবে অবহিত করেছেন। যে জনপদের মানুষ যালেমের যুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর কাছে মুক্তি ও নিষ্কৃতির আকুতি জানিয়ে কামনা করে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যকারী ও অভিভাবকের তাদের ডাকে সাড়া দেয়াটা কোনো যুদ্ধবাজের পরিচয় বহন করে না। এটি পরিচয় বহন করে মানবিক সাহায্য-সহযোগিতার চূড়ান্ত ও পূর্ণ পরাকাষ্ঠার। এভাবে যালেমের যুলুম থেকে মযলুম জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করার জন্যে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সর্বস্তরের জনমানুষের সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অংশ হিসাবে আল্লাহ তাআলা মানবতা মনুষ্যত্বের দুশমন, ষড়যন্ত্রকারী, কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর আগ্রাসী ভূমিকার সার্থক মোকাবেলার জন্যে এ যুদ্ধের শুধু অনুমতিই দেননি, এটাকে একটি বিশেষ পর্যায়ের জন্যে বাধ্যতামূলক করেছেন এবং

www.pathagar.com

তা করা হয়েছে মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে, সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার বিবেচনায় এবং অকল্যাণ ও অশান্তি দূর করার জন্যে। এ ক্ষেত্রে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি লক্ষ্যণীয় ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

অর্থ ঃ "তোমাদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর তা তোমাদের অসহ্য মনে হচ্ছে—হতে পারে কোনো জিনিস তোমাদের অসহ্য মনে হলো, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে এটাও হতে পারে যে, কোনো জিনিস তোমাদের ভাল লাগল, অথচ তা তোমাদের জন্যে খারাপ ! প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬

এ আয়াতের ভাষা থেকে প্রতীয়মান হয়, ঈমানদার জনগোষ্ঠীর প্রতি এ নির্দেশের মাধ্যমে যুদ্ধকে একটি পর্যায়ে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাসূল (সা)-এর নেতৃত্বে দীর্ঘ দিনের দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে (জিহাদে) নিয়োজিত থাকা অবস্থায় দাওয়াত ও শাহাদাতের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাঁরা যে মন-মানসিকতার অধিকারী হয়েছেন তাঁদের কাছে এ যুদ্ধের বিষয়টি খুব পসন্দের বা আকর্ষণের বিষয় ছিল না। আল্লাহ তাআলার ভাষায় ঃ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ 'সেটা তোমাদের কাছে অপসন্দনীয়।' আল্লাহ তাআলার একথাটি বাস্তব অবস্থার একটি বর্ণনা মাত্র। আল্লাহর পথে আল্লাহর দ্বীনের জন্যে যারা সংগ্রামরত তারা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ক্রোধ-আক্রোশ, হিংসা-বিদ্বেষের ঊর্ধে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্যেই আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তাঁরা সদয় ও সংবেদনশীল। আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর বান্দা হিসাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থেই এ নির্দেশ। তাই আল্লাহ এ নির্দেশের যথার্থতা মেনে নেয়ার জন্যে বলেছেন। তিনি আরো বলেন, হতে পারে তোমরা যা অপসন্দ করো তাতেই তোমাদের কল্যাণ আছে ; আর যা পসন্দ করো তাতে অকল্যাণ। আল্লাহ যা জানেন তোমরা তা জানো না।

www.pathagar.com

জিহাদের অংশ হিসাবে যুদ্ধের এ পর্যায়টি চিকিৎসকের পক্ষ থেকে রোগীর প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে সর্বশেষ বিকল্প হিসাবে অস্ত্রোপচারের সাথেই তুলনাযোগ্য। রাসূল (সা) এ বিষয়টিকে পরিপূর্ণভাবে বিবেচনায় রেখে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন ; তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধ মানুষের অকল্যাণ ও অশান্তি দূর করে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্যেই পরিচালিত হয়েছে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে জিহাদ মানে কেবল যুদ্ধ নয়। যুদ্ধ ইসলাম কায়েমের সর্বাত্মক আন্দোলনের একটি পর্যায় মাত্র। শাব্দিক অর্থে জিহাদ সর্বোত্তম আমল। তারই একটি পর্যায় যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (সা)-এর নেতৃত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং এর একটি বাস্তব উদাহরণ সুলেহ হুদাইবিয়া। যুদ্ধ না শান্তি এ শ্লোগানে যারা মুখর তারা রাসূলে পাক (সা) কর্তৃক গৃহীত সুলেহ হুদাইবিয়ার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করলে এ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন সম্ভব।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় শান্তির স্বার্থে, সংঘাত-সংঘর্ষ এড়াবার স্বার্থে, আল্লাহর রাসূল (সা) সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে সন্ধিতে সম্মত হয়েছেন। আপাত দৃষ্টিতে শান্তির শর্তগুলো উপস্থিত সমবেত সাহাবায়ে কেরামের কাছে অসম্মানজনক ও অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল (সা) সন্ধি চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন। কা'বা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এহরাম পরিহিত সাহাবায়ে কেরাম মক্কা প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় চরম বিক্ষুব্ধ ছিলেন। কা'বার তাওয়াফ ছাড়া ফিরে যেতে এবং এহরাম খুলতে তাঁরা মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। বরং তাঁদের মনের ক্ষোভ ছিল তুঙ্গে। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল (সা) এ সন্ধিকে চূড়ান্ত রূপে গ্রহণ করেছেন। কুরআন শরীফে একে প্রকাশ্য বিজয় রূপে অভিহিত করা হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ج لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ر مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ر لَاتَخَافُوْنَ ط فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ○

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "বস্তুত আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সঠিক স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যা পুরোপুরিভাবে সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আল্লাহ চাইলে তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে পূর্ণমাত্রার শান্তি-নিরাপত্তাসহ প্রবেশ করবে, নিজেদের মস্তক মুণ্ডন করবে ও চুল কাটবে। আর তোমরা কোনো ভয়ের সম্মুখীন হবে না। তিনি সে কথা জানতেন যা তোমরা জানতে না। এ কারণে সে স্বপ্ন পূর্ণ হবার পূর্বে তিনি এ নিকটবর্তী বিজয় তোমাদের দান করেছেন।"

–সূরা আল ফাতহ ঃ ২৭

উল্লেখিত হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী কোনো কোনোটা মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূলে না হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল (সা) এ শর্তসমূহ কঠোরভাবে পালন করেছেন। শুধু এটাই নয়, বিভিন্ন গোত্র ও পক্ষের সাথে গৃহীত সকল শান্তি ও সমঝোতা চুক্তি মেনে চলার নির্দেশও কুরআনে রয়েছে। সেই নির্দেশের সফল ও সর্বাত্মক বাস্তবায়নও হয়েছে রাসূলে পাক (সা)-এর নেতৃত্বে। প্রতিপক্ষের সন্ধি বিরোধী আচরণ সীমা ছাড়িয়ে যাবার পর গোপনে নয় প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে চুক্তি বাতিল করে কূটনৈতিক শিষ্টাচারের যে চরম পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়েছে, মানব ইতিহাসে তার নজির নেই। অনুরূপভাবে আবার মক্কা বিজয়ের ঘটনাকেও বিশ্লেষণ করতে পারি। মক্কা বিজয়ের অভিযানে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া হলেও অবশেষে যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন হয়নি। বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতেই রাসূল (সা)-এর নেতৃত্বে মক্কা বিজয়ের ঘটনা সংঘটিত হয়। এটা কোনোরূপ কল্প-কাহিনী নয়। বাস্তব সত্য ও ইতিহাসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা, যা একজন আদর্শ সমরনায়কের রণকৌশলের সর্বোচ্চ সাফল্য হিসাবে যেমন বিবেচ্য, তার চেয়েও বেশী বিবেচ্য মানবতা মনুষ্যত্বের মূর্তপ্রতীক শান্তি ও কল্যাণের মহানায়কের মহানুভবতা। তিনি ও তাঁর সাথী-সঙ্গীগণ নিজ জন্মভূমিতে দীর্ঘ ১৩টি বছর সীমাহীন যুলুম-নির্যাতনের শিকার ছিলেন। ক্রমবর্ধমান যুলুম-নির্যাতনের একটি পর্যায়ে তিনি ও তাঁর সাথী-সঙ্গীগণ, প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করে, বাপ-দাদার ভিটা-মাটি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ-সম্পদ সবকিছু হারিয়ে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

যদি ইসলামের এ যুদ্ধ—যা জিহাদের অংশবিশেষ, আল্লাহর জন্যে না হতো, আল্লাহর দীনের জন্যে না হতো, তাহলে এ পর্যায়ে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী মক্কা বিজয়ের এ ঘটনার সাথে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসামূলক কোনো ঘটনাই ঘটেনি। বরং চরম শত্রুদের প্রতি নিঃশর্ত ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি ওহুদের যুদ্ধে যে হিন্দা রাসূল (সা)-এর প্রিয় চাচা হামযা (রা) নিহত হবার পর তার কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল তাকেও আল্লাহর রাসূল (সা) ক্ষমা করতে দ্বিধা করেননি। হামজার হত্যাকারী ওয়াহশীকেও তিনি ক্ষমা করেছিলেন। ইতিহাসের এমন বিরল ঘটনা জেনেও যারা আল্লাহর রাসূল (সা)-কে যুদ্ধবাজ বলে আখ্যায়িত করে তারা নিসন্দেহে জ্ঞানপাপী। আল কুরআনে যুদ্ধ বিষয়ক আয়াতগুলোকে পূর্বাপর যোগসূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে উক্ত আয়াতসমূহের পটভূমিকে উপেক্ষা করে উক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে রাসূল পাক (সা)-এর গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে বিবেচনায় না এনে, যথাযথ মূল্যায়ন না করে, উক্ত আয়াতসমূহকে তথাকথিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের আধ্যাত্মিক ম্যানুয়াল হিসাবে চিহ্নিত করা রীতিমত বুদ্ধিবৃত্তিক অসাধুতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি নিশ্চিত করার জন্যে আল্লাহ তাআলা সর্বাত্মক সংগ্রাম-সাধনার যে নির্দেশ দিয়েছেন, যা জিহাদ নামে পরিচিত, যুদ্ধ তার একটি অংশ ও পর্যায় বটে। তবে ইসলামের যুদ্ধনীতি সর্বোচ্চ মানবিকতাবোধ সম্পন্ন। ইসলাম যেসব ক্ষেত্রে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করে, সেসব ক্ষেত্রেও যুদ্ধকে সর্বোচ্চ নৈতিক আচরণ দ্বারা বিধিবদ্ধ করে দেয়।

সৈন্যদের অভিযান আরম্ভ করার সময় যুদ্ধকালীন আচরণ সম্পর্কে আগাম উপদেশ দিয়ে দিতে হয় একথা ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগতের জানা ছিল না। অথচ খৃস্টীয় সপ্তম শতকেই আরবের নিরক্ষর নবী এটা চালু করেছিলেন। হযরত রসূলে করীম (সা)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোনো সেনাপতিকে যুদ্ধে পাঠাতেন তখন তিনি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে প্রথমে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিতেন। অতপর বলতেন ঃ

www.pathagar.com

اُغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ، اُغْزُوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تَغْلُوْا وَلَا تَمَثِّلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا ـ

"আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে অভিযান শুরু কর। আল্লাহর প্রতি যারা কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কিন্তু যুদ্ধে কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা খেলাপী করো না। গনীমতের মাল আত্মসাৎ করো না। লাশ বিকৃত করো না এবং কোনো শিশুকে হত্যা করো না।"

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) যখন সিরিয়ায় সৈন্য পাঠান তখন তাদেরকে দশটি নির্দেশ দিয়ে দেন। সকল ঐতিহাসিক ও হাদীস বিশারদগণ সেই নির্দেশগুলো উদ্ধৃত করেছেন। সে নির্দেশ ছিলো এই ঃ

১. নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে কেউ যেন হত্যা না করে।

২. লাশ যেন বিকৃত করা না হয়।

৩. সন্যাসী ও তপস্যীদের যেন কষ্ট না দেয়া হয় এবং কোনো উপাসনালয় ভাঙা-চোরা না হয়।

৪. ফলবান বৃক্ষ যেন কেউ না কাটে এবং ফসলের ক্ষেত যেন পোড়ানো না হয়।

৫. জনবসতিগুলোকে (সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে) যেন জনশূন্য না করা হয়।

৬. পশুদের যেন হত্যা করা না হয়।

৭. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা চলবে না।

৮. যারা আনুগত্য স্বীকার করবে তাদের জানমালকে মুসলমানদের জানমালের মত নিরাপত্তা দিতে হবে।

৯. গনীমতের সম্পত্তি যেন আত্মসাৎ করা না হয়।

১০. যুদ্ধে যেন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা না হয়।

এ নির্দেশাবলী অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, ইসলাম যুদ্ধকে সমস্ত হিংসাত্মক কর্ম ও থেকে পবিত্র করে দিয়েছিল। অথচ সে সময়ে

www.pathagar.com

হিংসাত্মক কার্যকলাপ ছিল যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যুদ্ধবন্দী ও দূত হত্যা, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের হত্যা, যুদ্ধাহতদের হত্যা, বেসামরিক লোকদের হত্যা, অঙ্গ-প্রত্যংগ কাটা ও ছেড়া, লাশের অবমাননা, আগুন দিয়ে পোড়ানো, লুটপাট, রাহাজানি, ফসল ও জনপদসমূহের ক্ষতিসাধন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও চুক্তি লংঘন, সৈন্যদের বিশৃঙ্খলা, আনুগত্যহীনতা, হৈ চৈ ও হাঙ্গামা সহকারে যুদ্ধ করা—এসবই বে-আইনী ও নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। এভাবে যুদ্ধের একমাত্র যে পরিচয় অবশিষ্ট রইল, তাহলো ঃ একজন বীর সৈনিক শত্রুর সর্বনিম্ন পরিমাণ ক্ষতি সাধনপূর্বক তার অকল্যাণ বা অনিষ্ট রোধ করে যে কাজের মাধ্যমে সেই যুদ্ধই ইসলাম অনুমোদন করে।

পরিশেষে বলতে চাই, ইসলামের যুদ্ধনীতি মানবজাতির বৃহত্তর স্বার্থে, শান্তি ও কল্যাণের জন্যে, ফেতনা-ফাসাদের মূলোৎপাটনের জন্যে, রক্তপাত, নৈরাজ্য তথা ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি বা বৃদ্ধির জন্যে নয়। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কোনো অধিকার নেই কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার, যেহেতু শাসকদের ঘোষণা ছাড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণও বৈধ নয়। কারণ এগুলো ফেতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি ছাড়া সমাজকে ইতিবাচক কিছু দিতে পারে না। আল কুরআনে যুদ্ধের নির্দেশ ফেতনা-ফাসাদের পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্যে, ফেতনা-ফাসাদকে উস্কে দেয়ার জন্যে নয়।

❐

www.pathagar.com

১. ইসলামী আন্দোলনের ধারা এক অব্যাহত ধারা

আল্লাহর যমীনে মানুষের সমাজে শান্তি, কল্যাণ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যে রাষ্ট্রযন্ত্রসহ মানুষের জীবন জিন্দেগীর সর্বক্ষেত্রে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলে আসছে আবহমান কাল থেকেই। সমস্ত নবী-রাসূলগণ এ আন্দোলনের পথিকৃত। আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব ও সহীফা ছিল আন্দোলনের গাইড বুক। রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে নবুওয়াতের এ ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তিনি সর্বশেষ নবী। আল কুরআন হলো আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব। মুহাম্মাদ (সা)-এর পর আর কোনো নবী-রাসূল (আ) আসবেন না। কুরআনের পরে আর কোনো কিতাব আসবে না। কিন্তু কেয়ামত পর্যন্ত সব মানুষের কাছে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো, দ্বীন কায়েম করা ও কায়েম রাখার কাজটি চলতে থাকবে। এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকেই কুরআন ও হাদীসে জিহাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর সেই জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এ মর্মে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা) ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثٌ مِنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلاَ نُخْرِجُهُ مِنَ الْاِسْلاَمِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُقَاتِلَ اٰخِرُ اُمَّتِىْ الدَّجَّالَ لاَيُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ وَالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ ـ رواه ابو داؤد

অর্থ ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। সেগুলো হলো ঃ (১) যে ব্যক্তি ঘোষণা করে —আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাকে আঘাত করা থেকে হাত নিয়ন্ত্রণ করা। কোনো একটি গুনাহের জন্যে আমরা তার প্রতি কুফরি

www.pathagar.com

আরোপ করবো না এবং তাকে ইসলাম থেকেও বের করে দেব না। (২) আমার আবির্ভাব থেকে জিহাদের ধারা জারি হয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে দাজ্জালের বিরুদ্ধে আমার সর্বশেষ উম্মতের লড়াই করা পর্যন্ত। কোনো অত্যাচারীর অত্যাচার কিংবা কোনো বিচারকের বিচার এ জিহাদকে বাতিল করে দিতে পারবে না। (৩) আর তৃতীয় মৌলিক বিষয়টি হলো তাকদীরের প্রতি ঈমান।–আবু দাউদ ঃ আনাস ইবনে মালেক (রা)

কেয়ামত পর্যন্ত দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রাম চলবে। রাসূল পাক (সা) তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন শেষে দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগে তাঁর উম্মাতের উপরে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন মূলত আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমেই। ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণের সবটাই গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে দুটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমটি ঃ "আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। একটি হলো আল্লাহর কিতাব, অপরটি আমার সুন্নাত। তোমরা যতদিন এ দুটো আঁকড়ে ধরে থাকবে, অবলম্বন করে চলবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হবে না।"

দ্বিতীয়টি ঃ "তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছ, অনুপস্থিত লোকদের কাছে আমার একথাগুলো পৌছে দিও।"

যুগ ও বংশ পরিক্রমায় কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় যত মানুষ আসবে সব মানুষের কাছে রাসূল (সা)-এর বাণী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তাঁর সকল উম্মতকে এ নির্দেশের আলোকে পালন করে যেতে হবে। আল্লাহর রাসূল (সা) যেহেতু শেষ নবী তাই তাঁর উপর নাযিলকৃত কিতাবের পরিপূর্ণরূপে সংরক্ষণ ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। সেই সাথে কুরআনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে রাসূল (সা) গৃহীত বাস্তব পদক্ষেপ এবং এ সংক্রান্ত তাঁর মুখঃনিশ্রিত বক্তব্য আল্লাহর সাহায্যে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন থেকে শুরু করে উম্মাতে মুসলিমার নিষ্ঠাবান ওলামায়ে কেরাম নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে সংরক্ষণের জন্যে ধারাবাহিকভাবে

www.pathagar.com

আজকের দিন পর্যন্ত অবদান রেখে আসছেন। কেয়ামত পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে শেষ নবীর উম্মত হিসাবে সাধারণভাবে সকল মুসলমানের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ ব্যাপারে আল কুরআনের দুটি আয়াত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ -

অর্থ ঃ "এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল। আহলি কিতাব ঈমান আনলে তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর হতো, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায় ; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা আল বাকারায় ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط

অর্থ ঃ "আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যম পন্থানুসারী উম্মত বানিয়েছি, যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন সাক্ষী হয় তোমাদের উপর।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩

এ দুটি আয়াতের আলোকে خير امة (উত্তম জাতি) ও امة وسط (মধ্যপন্থী জাতি) সকলেই দুনিয়ার মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর, দ্বীনের পথে ডাকা, সৎপথে চালাবার, অসৎপথে বাধা দেয়ার

www.pathagar.com

কাজটি যেমন কথার মাধ্যমে আঞ্জাম দেবে, তেমনি বাস্তব কর্মপন্থা ও আমল-আখলাকের মাধ্যমে অনুকরণ-অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে আঞ্জাম দিবে।

এছাড়া উম্মতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তথা আলেম ওলামার উপর এ কাজের দায়িত্ব বিশেষভাবে অর্পণ করা হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে, যারা নেকী ও কল্যাণের দিকে ডাকবে। ভাল ও সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই সফলতা পাবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪

এছাড়াও রাসূলে পাক (সা)-এর হাদীসসমূহে উম্মতের আলেম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিশেষ মর্যাদা ও ভূমিকার কথা উল্লেখ রয়েছে ; মূলত উম্মতের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা, সহযোগিতা করা ও পরিচালনা করার জন্যে। একটি হাদীসের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ قَائِمَةً بِاَمْرِ اللّٰهِ لاَيَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ اَوْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ عَلَى النَّاسِ ـ رواه مسلم

অর্থ ঃ "আমার উম্মতের মধ্যে সদাসর্বদা একটি দল আল্লাহর নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কোনো অবমাননাকারীর অবমাননা, কোনো বিরোধিতাকারীর বিরোধিতা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে শেষ ফায়সালা আসা পর্যন্ত তারা এর উপর অটল ও অবিচল থাকবে।"–মুসলিম

ইসলামের ইতিহাসে খেলাফতে রাশেদার পর থেকে আজকের সময় পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে আল্লাহর কিছু বান্দা আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার,

www.pathagar.com

কায়েম রাখার অব্যাহত প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আসছেন। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কিছু দেশে সিদ্ধান্তকারী পর্যায়ে বা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত।

www.pathagar.com

২. ইসলামের বিজয় অনিবার্য

এ প্রসঙ্গে রাসূলে পাক (সা)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে–যাতে রাসূলে পাক (সা)-এর একটি ভবিষ্যত বাণীর উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

"তোমাদের দ্বীনের আরম্ভ নবুওয়াত ও রহমতের মাধ্যমে এবং তা তোমাদের মধ্যে থাকবে–যতক্ষণ আল্লাহ চান। অতপর মহান আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত পরিচালিত হবে–যতদিন আল্লাহ চান। অতপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন। তারপর শুরু হবে দুষ্ট রাজতন্ত্রের যামানা এবং যতদিন আল্লাহ চাইবেন তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন।

অতপর যুলুমতন্ত্র শুরু হবে এবং তাও আল্লাহ যতদিন চাইবেন, ততদিন থাকবে। অতপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন। অতপর আবার নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। নবীর সুন্নাত অনুযায়ী তা মানুষের মধ্যে কাজ করে যাবে এবং ইসলাম পৃথিবীতে তার কদম শক্তিশালী করবে। সে সরকারের ওপর আকাশবাসী ও দুনিয়াবাসী সবাই খুশী থাকবে। আকাশ মুক্ত হৃদয়ে তার বরকত বর্ষণ করবে এবং পৃথিবী তার পেটের সমস্ত গুপ্ত সম্পদ উদগীরণ করে দেবে।"–মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাযা, মুসতাদরাক।

নুবওয়াতের পরে আসবে খেলাফতের যুগ, তার পরে রাজতন্ত্র বা মুলকিয়াতের যুগ, এর পরে যুলুমতন্ত্রের যুগ। পরিশেষে আবার আসবে খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াতের যুগ। ইতিহাস সাক্ষী, শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়াতের দায়িত্বের পূর্ণতা ও পরিসমাপ্তির পর খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বে পরিচালিত সার্বজনীন খেলাফতী শাসন ব্যবস্থা বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এরপরে আসে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার যুগ যা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। গণবিচ্ছিন্ন এ শাসন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে

www.pathagar.com

অমুসলিম উপনিবেশবাদী শাসন ব্যবস্থা জেঁকে বসার সুযোগ করে নেয়, যা কমবেশী প্রায় দুই শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। হাতে গোনা দু একটি দেশ ছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গোটা মুসলিম জাহানই এদের হাতে নিষ্পেষিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক শাসকদের কবল থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার লক্ষে আন্দোলন হয়। এ আন্দোলনের সূচনায় এবং গণপর্যায়ে সর্বত্রই আলেম-ওলামা ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের উদ্যোগী ভূমিকা থাকলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে মুসলমানদের স্বাধীন দেশ ও রাষ্ট্রের পরিচালনার দায়িত্ব আসে মুসলিম নামধারী ঔপনিবেশক শাসকদের মানস সন্তানদের হাতে। এ কারণে প্রায় সবগুলো মুসলিম দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ইসলামী শাসন ব্যবস্থার কথা বলা হলেও স্বাধীনতা উত্তর সময়ে প্রায় সব দেশেই অমুসলিম ঔপনিবেশিক শাসকদের চেয়েও নির্মমভাবে ইসলামী শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার আন্দোলনকে দমন করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের বিজয় অনিবার্য, কেউ তা রুখতে পারবে না।

❐

www.pathagar.com

৩. দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলনের উপর যুলুম নির্যাতন

এতদসত্ত্বেও প্রায় দুনিয়ার সর্বত্রই আল্লাহর কিছু সংখ্যক বান্দা নিজ নিজ দেশের পরিবেশ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে ইসলামের সঠিক দাওয়াত ও শিক্ষার প্রচার, প্রসার ও উপস্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী ইসলামী জাগরণের একটি উজ্জল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী ইসলামের জাগরণ সৃষ্টির এ সম্ভাবনার প্রেক্ষাপট রচনায় মধ্যপ্রাচ্যে পথিকৃতের ভূমিকা রেখেছেন ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ মিসর কেন্দ্রিক আরব বিশ্বের বৃহত্তর ইসলামী সংগঠন ইখওয়ান আল মুসলিমুন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার অপরাধে মাত্র ৪২ বছর বয়সে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর সার্থক উত্তরসূরি ও সহকর্মী আবদুল কাদের আওদাহ, সাইয়েদ কুতুব ও হামিদা কুতুবসহ অসংখ্য ইসলামী ব্যক্তিত্বকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। অদ্যাবধি তাঁরা ইখওয়ানের নামে মিসরে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাবার অনুমতি পায়নি। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের দেশে দেশে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বই-পুস্তক বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত ও আলোচিত হয়ে আসছে। যার প্রভাব প্রতিপত্তি সুদূরপ্রসারি হওয়ার উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে।

হিমালয়ান উপমহাদেশে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী ১৯৪১ সনে অখণ্ড ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা আজ স্বতন্ত্রভাবে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় স্ব-স্ব দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতাকে সামনে রেখে কাজ করছে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে উপমহাদেশ স্বাধীন ও ভারত বিভক্তির পর ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিতে জামায়াতে ইসলামী বারবার যুলুম নির্যাতনের শিকার হয়। উপমহাদেশ ভাগ হয় '৪৭ সালে। তখন থেকেই শুরু হয় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর উপর তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর আঘাত। পাকিস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার দাবীর

www.pathagar.com

অপরাধে আইয়ুবের শাসনে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ১৯৫৩ সালে লাহোরের সামরিক আদালতে কাদিয়ানী দাঙ্গার কৃত্রিম অযুহাতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় যা বিশ্ব জনমতের চাপের কারণে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত করা হয়। ১৯৬৪ সনে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান তৎকালীন পাকিস্তানের উভয় অংশে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং সারা দেশের জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে আটক করে। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে অবশেষে উক্ত নিষেধাজ্ঞা অবৈধ বিবেচিত হয়। জামায়াত প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ পায়।

তুরস্ক কেন্দ্রিক মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক খেলাফত ব্যবস্থা অবসানের পটভূমিতে আরব জাতীয়তাবাদ ও তুর্কি জাতীয়তাবাদের ছদ্মাবরণে ঔপনিবেশিক চক্রান্তের নীল নকশার আদলে একদিকে যেমন আরব বিশ্বকে টুকরো টুকরো করা হয় তেমনি মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী সম্ভাবনাময় একটি দেশকে ধর্মনিরপেক্ষতার লীলাভূমিতে পরিণত করে ইসলামী বিধান ও সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও পৃষ্ঠপোষক এ দেশ থেকে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস চালানো হয়। তুরস্কের এ যুগসন্ধিক্ষণে বদিউজ্জামান নূরসি ইসলামী আদর্শ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ নেন এবং অকুতোভয় সৈনিকের ভূমিকা পালন করেন। খেলাফতের শেষ চিহ্ন বিলুপ্তির পটভূমিতে আধুনিক তুরস্কে এখনো ইসলামের নামে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ার, ইসলামের ভিত্তিতে রাজনৈতিক বক্তব্য দেয়ার সাংবিধানিক বা আইনগত সুযোগ নেই। এতদসত্ত্বেও বদিউজ্জামান নূরসি প্রতিষ্ঠিত নূর তালাবার আন্দোলনের সুদূর প্রসারী প্রভাব তুরস্কের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের উপরে দারুণ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়াতেও ইসলামী আন্দোলনের প্লাটফর্ম মাসজুমি পার্টি নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে '৬০-এর দশকে ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করার পদক্ষেপ নিয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের মানস সন্তানতুল্য নেতৃত্ব।

www.pathagar.com

মধ্যপ্রাচ্যের একটি পটেনশিয়াল দেশ আলজেরিয়া। যার স্বাধীনতা আন্দোলনে ইসলাম ছিল অন্যতম প্রধান ইস্যু। এরপরেও সেখানে একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উপনিবেশ আমলের চেয়ে কঠোর ও নিষ্ঠুরভাবে ইসলামী শক্তিকে কোণঠাসা করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে '৯০-এর দশকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে যখন উপনীত হয় তখনি বুদিয়াফকে দিয়ে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ইসলামের পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সেই গণজাগরণকে কঠোর ও নির্মমভাবে দমন করা হয় এবং ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্টের একটি অংশকে ঠেলে দেয়া হয় সশস্ত্র তৎপরতার দিকে। গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ন ও মানবাধিকারের প্রবক্তাদেরকে এখানে রহস্যজনকভাবে নীরব দেখা যায়।

মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটি সম্ভাবনাময় দেশ সুদানে মুসলিম ব্রাদার হুড (ইখওয়ানুল মুসলিমুন)-এর অগ্রযাত্রা রোখার জন্যে জেনারেল নিমেরির সামরিক শক্তিকে ক্ষমতায় বসানো হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ইখওয়ান নেতৃবৃন্দের একাংশ যখন সামরিক শক্তির সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিকভাবে সুদানকে ইসলামী করণের সিদ্ধান্ত নেয় তখন অর্থনৈতিক অবরোধের খড়্গ ঝুলিয়ে এবং বিশেষ অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে উস্কে দিয়ে এ উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে।

১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে একটি সফল গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইরানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে তাদের হাজার বছরের লালিত আকীদা-বিশ্বাসের ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের ফলশ্রুতিতে আত্মপ্রকাশ করে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান'। ইরানের সর্বস্তরের গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সৃষ্ট এ বিপ্লবকে নস্যাৎ করার জন্য ইসলামের ও মুসলমানদের বৈরী শক্তি সাদ্দামের নেতৃত্বে একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় ইরানের উপর, যা স্থায়ী হয় দীর্ঘ দশ বছর। এর ফলশ্রুতিতে দুটি সম্ভাবনাময় মুসলিম দেশের শক্তি ও সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় মারাত্মকভাবে। এ ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশ ইরাককে শক্তি যুগিয়েছিল পরবর্তীতে সাদ্দাম তাদেরকেই

www.pathagar.com

আক্রমণ করে বসে। যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনীদের অবস্থান পাকাপোক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অবশেষে সাদ্দাম এবং তার দেশও ঐ শক্তির কোপানলে পড়ে, যাদের ক্রীড়নক হিসাবে তিনি দীর্ঘ দশ বছর যুদ্ধ পরিচালনা করেন ইরানের বিরুদ্ধে।

মুসলিম বিশ্বের কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ দেশ আফগানিস্তান —যা ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে মুক্ত ছিল। সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও পালাবদলের একটি পর্যায়ে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার অল্প ব্যবধানে রাশিয়ার পক্ষ থেকে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে। যার ফলে সেখানে গড়ে উঠে বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপের নেতৃত্বে সশস্ত্র প্রতিরোধ। রাশিয়া-আমেরিকার স্নায়ুযুদ্ধের কারণে আফগানিস্তানে রাশিয়ার দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত এ সশস্ত্র প্রতিরোধে আমেরিকাও শক্তি যোগায়। তাদের নীল নকশায় রাশিয়ার দখলদার বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগে বাধ্য হওয়ার পর পরিস্থিতির দাবী ছিল বিভিন্ন গ্রুপের সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠন এবং অল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচিত সরকার গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন। কিন্তু পরাশক্তিসমূহের সুদূর প্রসারী নীল নকশার আওতায় তা হতে দেয়া হয়নি। বরং বিভিন্ন গ্রুপকে ক্ষমতার লড়াইয়ে জড়িয়ে ফেলার মাধ্যমে তাদের দীর্ঘ দিনের ত্যাগ কুরবানীকে অর্থহীন করে দেয়া হয়। প্রধান প্রধান গ্রুপগুলোকে ব্যর্থ প্রমাণ করে একটি পরাশক্তি তালেবানদের ক্ষমতায় আনে। আবার তাদেরই সৃষ্ট উসামা বিন লাদেনের প্রসঙ্গ তুলে নতুন চক্রান্ত আঁটা হয়। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালের নিউইয়র্ক এর টুইন টাওয়ারের সূত্র ধরে উসামা বিন লাদেন ও তার দলকে দায়ী করে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালাবার প্রেক্ষাপট তৈরী করা হয় এবং সেই অভিযানের জন্যে ব্যবহার করা হয় একটি মুসলিম দেশের ভূমিকে।

মুসলমানদের তৃতীয় তীর্থ ভূমি ফিলিস্তিনের কেন্দ্রস্থল জেরুজালেম। সেখানে রয়েছে মুসলমানদের পহেলা কেবলা বায়তুল মাকদাস। অসংখ্য নবী-রাসূলের আগমন ঘটে এখানেই। তাই ফিলিস্তিন একটি দেশমাত্র নয়, এটি আরব বিশ্বের অন্যতম প্রাণকেন্দ্রও বটে। মুসলমানরা যখন

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ দেশ শাসনের শুভ সূচনা করতে যাচ্ছিল ঠিক এমনি সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের বুকের উপর একটি বিষ ফোঁড়ার মতো অবৈধ ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্ম দেয়া হয়। বিতাড়িত করা হয় সেখানকার ফিলিস্তিনী আরব মুসলিমদেরকে। ফিলিস্তিনের ভূ-সন্তানেরা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রতিবেশী বিভিন্ন আরব দেশের শরণার্থী শিবিরে উদ্বাস্তু হিসাবে বসবাস করে। প্যালেস্টাইনী জনতা স্বদেশভূমি পুনরুদ্ধারে দীর্ঘদিন মুক্তির সংগ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রাম করেও স্বদেশভূমি পুনরুদ্ধারে এখনো সক্ষম হয়নি। অবৈধ ইসরাঈল রাষ্ট্রটি যেসব পরাশক্তির আশীর্বাদপুষ্ট তাদের অব্যাহত চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ইসরাঈলকে সমরাস্ত্রে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি অব্যাহত কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিতদের উপর থেকে কার্যত সিরিয়া ও জর্ডানের সমর্থন তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করে এসব দেশ থেকে ইসরাঈলের উপরে আঘাত হানার পথ রুদ্ধ করে দেয়।

এছাড়া যেসব দেশ থেকে ফিলিস্তিনিরা অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতা পেত তাও গুটিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত যে অংশটি ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং ইসলামের জন্যেই মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত, তারা প্রবাস থেকে যুদ্ধ পরিচালনার পরিবর্তে দেশের ভিতরে থেকে 'গণঅভ্যুত্থান' সংঘটিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। যেটা 'ইন্তেফাদা' নামে পরিচিত। যার নেতৃত্ব দিচ্ছে হামাস। ইন্তেফাদাহ আন্দোলনের কার্যকারিতা আঁচ করে একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে 'যেরিকো' নগরকে কেন্দ্র করে সীমিত স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রের কাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয় আমেরিকার পক্ষ থেকে। উপায়ন্তর না দেখে পারিপার্শ্বিকতার চাপে ইয়াসির আরাফাত এ প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে মিসরের আনোয়ার সাদাতের নেতৃত্বে ইসরাঈল ও মিসরের মধ্যকার সমঝোতার জন্যে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিকে আরব বিশ্ব প্রত্যাখ্যান করে। শুধু তাই নয়, মিসরকে তারা বয়কটেরও হুমকি দিয়েছিল। ইয়াসির আরাফাতের সাথে মার্কিনীদের মধ্যস্ততায়

www.pathagar.com

ইসরাঈলের সাথে সর্বশেষ সমঝোতা ক্যাম্প ডেভিড-এর তুলনায় আরো অনেক বেশী অসম হওয়া সত্ত্বেও আরব বিশ্ব রহস্যজনকভাবে নীরবে এটি মেনে নেয়। ১৯৯০/৯১ সালে ইরাকের কুয়েত দখল ও আমেরিকার সহযোগিতায় কুয়েত মুক্তির পটভূমিতে আমেরিকা এ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়। ইরাকের কুয়েত দখলের ফলে উদ্ভূত বা সৃষ্ট এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি না হলে হয়তো এটি সম্ভব হতো না। ইসরাঈলের পৃষ্ঠপোষক ও মুরব্বি দেশগুলো এ ব্যবস্থার মাধ্যমে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল। তার একটি হলো, ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে হামাসের কার্যকর গণঅভ্যুত্থান ঠেকানোর জন্যে ইয়াসির আরাফাতের সরকারকে ব্যবহার করা। দ্বিতীয়টি, ইসরাঈলকে ভেতর ও বাইরের সকল প্রকারের হুমকি থেকে মুক্ত করা। ইয়াসির আরাফাত ও তার সাথী-সঙ্গীরা এ প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল তাদের সামনে আর কোনো বিকল্প পথ না থাকার কারণে এবং মুক্তি সংগ্রামের দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি-শ্রান্তি, হতাশা-নিরাশা ও বিচিত্র তিক্ত অভিজ্ঞতার পটভূমিতে নিজ ভূখণ্ডে পা রাখার একটি ন্যূনতম সুযোগ হিসাবে। শত হতাশার মধ্যেও একটি আশার দিক হলো হামাস এবং ইয়াসির আরাফাতের সরকারকে নিয়ে ইসরাঈল ও তাদের মুরুব্বি যে খেলা খেলতে চেয়েছিল, উভয় পক্ষকে তারা যে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল, তারা উভয়েই অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সেই ফাঁদে পড়া থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়েছে। নিজেদের মধ্যে একটি অলিখিত ও অঘোষিত সমঝোতাও বজায় রেখেছে, যা ইসরাঈল ভালো চোখে দেখতে পারেনি। তাই ফিলিস্তিনে হামাসকে নির্মূল করার লক্ষ্যে পরিচালিত ইসরাঈল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাত্রা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ইয়াসির আরাফাতের জন্য সৃষ্টি করা হয় বিপজ্জনক পরিস্থিতি। কার্যত তাঁকে রাখা হয় গৃহবন্দী হিসাবে। তাঁর স্বাস্থ্যের চরম অবনতি ঘটে এবং জীবন অবসান হয় মূলত এ প্রেক্ষাপটেই।

❐

www.pathagar.com

৪. প্রয়োজন বাস্তবধর্মী ভূমিকা

আমরা এ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতির বিশেষ বিশেষ দিক সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করেছি, মূলত এটা বুঝানোর জন্যে যে, রাসূলে পাক (সা)-এর ভবিষ্যত বাণীতে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অবসানের পর যে যুলুমতান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখ আছে, বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ সেই অধ্যায়টিই অতিক্রম করছে।

মুসলমানদের আজকের এ অবস্থা ও পরিস্থিতি ঔপনিবেশিক শাসনের চেয়েও ভয়াবহ, দুঃসহ ও দুর্ভাগ্যজনক। তবে ইতিহাসের এটাই সর্বশেষ অধ্যায় নয়। রাসূল পাক (সা)-এর ভবিষ্যত বাণী অনুযায়ী এ অধ্যায়ের অবসান হবে এবং এরই পটভূমিতে আবার কায়েম হবে সারা বিশ্বব্যাপী খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত বা বিশ্বজনীন সার্বজনীন ইসলামী খেলাফতী শাসন ব্যবস্থা। ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়টি মুসলিম উম্মাহর ঈমানের অগ্নি পরীক্ষার অধ্যায়। চরম ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় আসবে। অবশ্যই আসবে–ঈমানদার মানুষের মনে এ দৃঢ় প্রত্যয় অবশ্যই থাকতে হবে। সেই সাথে থাকতে হবে ইসলামের প্রতিপক্ষের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। শুধু আবেগতাড়িত হয়ে নয়, বিপ্লবী অতি বিপ্লবী বক্তব্যের মাধ্যমে নয়, বরং বস্তুনিষ্ঠ এবং বাস্তবধর্মী পথ, কৌশল উদ্ভাবন ও অবলম্বনের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলার চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এক শ্রেণীর মুসলিম নামধারী রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিকদের মাধ্যমেই ইসলাম বিরোধী মহল মুসলমানদের জন্যে আজকের এ প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামী জাগরণ ঠেকাবার জন্যে তাদের চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রেক্ষাপট সৃষ্টির জন্য ইসলামপন্থীদের উপর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে নির্মূল ও নিষ্ঠুর যুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আবার যুলুম নির্যাতনের শিকার কোনো কোনো ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ক্ষোভকে কাজে লাগানোর জন্যে তাদেরকে সুকৌশলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে এবং এ কাজে

www.pathagar.com

পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে। অপরদিকে তাদের কার্যক্রমের দায়-দায়িত্ব নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ধারায় পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনসমূহের উপর চাপানো হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ইহুদীবাদী-জায়নবাদীদের নিয়ন্ত্রিত ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

www.pathagar.com

৫. ইসলামী আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম

বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিবাচক জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম প্রচারে তাদের অনীহা লক্ষণীয় ; বরং ব্লাক আউট করা বা বিকৃত করে পরিবেশন করাই তাদের রীতিতে পরিণত হয়েছে। নৈতিক অবক্ষয়ের এ যুগে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি যেখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, সেখানে বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলন নীতি-নৈতিকতা ও গণতান্ত্রিক আচার আচরণের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ধর্মী ভূমিকা পালন করছে। তার স্বীকৃতির পরিবর্তে এসবের অবমূল্যায়ন করে ইসলামী নেতা ও ব্যক্তিদের চরিত্র হনন ও ইসলামের পক্ষের শক্তির ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করার জন্যে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। যার মূল লক্ষ্য ইসলামের প্রতি বিশ্বব্যাপী যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে তা যেন কোনো অবস্থায় গণজাগরণে রূপ নিতে না পারে। তারা বিশ্বজনমতকে ইসলামের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে চলেছে। ইহুদীবাদী, জায়নবাদী গোষ্ঠী জানে রাসূল (সা)-এর ভবিষ্যত বাণীর আলোকে বিশ্বব্যাপী নবুওয়াতের পদাংক অনুসারী খেলাফতী শাসনব্যবস্থা কায়েমের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এটা তারা কোনো অবস্থায় মেনে নিতে রাজী নয় ; বরং যে কোনো মূল্যে তারা একে রুখে দিতে বদ্ধপরিকর। ইতিপূর্বে তাদের ধর্মগ্রন্থ অর্থাৎ তাওরাতের সূত্রেই ইহুদীরা জানত শেষ নবীর আগমনের কথা। তাঁর পরিচয়টি তাদের কাছে পরিষ্কার ছিল। কিন্তু শেষ নবী বনী ইসরাঈল গোত্র থেকে না হয়ে বনী ইসমাঈলের গোত্র থেকে হওয়ার কারণে তারা এটা গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। বরং বিরোধিতা করেছে এমনকি প্রাণনাশের চেষ্টা করতেও দ্বিধা করেনি। সেই অভিশপ্ত ইহুদী জাতি আবার শেষ নবীর পদাংক অনুসারী খেলাফতী শাসনব্যবস্থা কায়েমের বিষয়টি কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। বরং এটা নস্যাৎ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে এটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে তারা তিনটি কৌশল অবলম্বন করেছে।

এক ঃ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে, এরা তাদেরকে পকেটস্থ করেছে। এদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামী জাগরণ

www.pathagar.com

ঠেকাবার জন্য মুসলিম শাসকগোষ্ঠী অথবা প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহকে ব্যবহার করছে। আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সাহায্য সহযোগিতার নামে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের মাধ্যমেও তারা এ লক্ষ্য হাসিলের চেষ্টা করছে।

দুই ঃ বিভিন্ন দেশের সরকার ও প্রশাসন যন্ত্রকে দিয়ে ইসলামী সংগঠন ও সংস্থাসমূহের কাজের ক্ষেত্র সংকুচিত করার অপপ্রয়াসের পাশাপাশি তাদের উপর যুলুম নির্যাতন অথবা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে যুক্তিসংগত প্রমাণ করার জন্য উল্টো ইসলামী সংগঠনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ক্ষেত্রভেদে তাদের পরিকল্পনায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু তথাকথিত ইসলামী জঙ্গী সংগঠন গড়ে তোলার দায়-দায়িত্ব ইসলামী আন্দোলনের উপর চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে।

তিন ঃ যেসব দেশে ইসলামী আন্দোলন মোটামুটি সম্ভাবনাময় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেখানে তথাকথিত ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের জঙ্গী তৎপরতার কাল্পনিক কাহিনী প্রচারের মাধ্যমে গোয়েবলসের থিওরিকে বাস্তবায়ন করার অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অসত্য ও ভিত্তিহীন কাল্পনিক কথাগুলোকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামী আন্দোলনের উপর এবং সম্ভাবনাময় ইসলামী দেশের উপর চরম আঘাত হানার প্রেক্ষাপট তৈরী করা হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি এবং এক শ্রেণীর সংবাদপত্র তাদের সহায়তা করছে। এমনকি অনেকেই কাল্পনিক তথ্য দিয়ে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার, তাদের আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ার ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করছে। এদের এ দুঃখজনক ও লজ্জাকর কার্যক্রম ইসলামের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের অপতৎপরতাকেও হার মানায়।

❐

www.pathagar.com

১. স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সন্ত্রাসবাদ এক জিনিস নয়

ইসলামকে জড়িয়ে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে কয়েকটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। অথচ আন্তর্জাতিকভাবে এটা স্বীকৃত বিষয় যে, স্বাধীনতা সংগ্রামকে কখনো সন্ত্রাসবাদ নামে আখ্যায়িত করা যায় না। ফিলিস্তিনীদের জন্মগত অধিকার ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে অর্ধ শতাব্দীরও বেশী কাল ধরে। তারা নিজেদের হৃত অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্যে সংগ্রাম করছে ; যার প্রতি বিশ্বের সকল শান্তিকামী, মুক্তিকামী মানুষের সহানুভূতি ও নৈতিক সমর্থন রয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা অব্যাহতভাবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও গণহত্যার শিকার। এ গণহত্যা ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে যারা নিন্দা করতে পারে না তারাই আবার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নির্মূল নিয়ে ব্যস্ত এবং এটা করতে গিয়ে বিশ্বে একের পর এক আরো অঘটন ঘটাচ্ছে। এটাও এক ধরনের সন্ত্রাস বটে। এ রাষ্ট্রীয় সন্তাসবাদের মাধ্যমে সন্ত্রাসকে কার্যত উস্কে দেয়া হচ্ছে, সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের নামে সন্ত্রাসকে আন্তর্জাতিক করণ করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনের এ বিশেষ পরিস্থিতিতে ও প্রেক্ষাপটে যদি কেউ আত্মঘাতি পথ বেছে নিতে বাধ্য হয় তাহলে তার দায়-দায়িত্ব ইসরাঈল কর্তৃপক্ষ ও তাদের পৃষ্ঠ-পোষকদের উপরই বর্তায়। এর সূত্র ধরে ইসলামের উপর জঙ্গীবাদের অপবাদ চাপানোর কোনো যুক্তি নেই।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের আলোচনার আরেকটি মাত্রা যোগ হয়েছে আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে। অন্য কোনো দেশের ইসলামী আন্দোলনের সাথে এটার কোনো তুলনা করার বা যোগসাজশ খোঁজার যুক্তিসংগত কোনো কারণ নেই। আফগানিস্তানের ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে একটি পরাশক্তি সশস্ত্র সামরিক অভিযান চালিয়ে দখলদার বাহিনীর ভূমিকা পালন করে। তার বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ সেখানে সশস্ত্র প্রতিরোধে রূপ নেয়। স্বাভাবিক কারণে এ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সংগ্রামে

www.pathagar.com

যেমন তারা মুসলিম বিশ্বের সহানুভূতি পেয়েছে, তেমনি আরেকটি পরাশক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতাও লাভ করেছে। আফগানিস্তান দখলদার বাহিনী মুক্ত হওয়ার পরবর্তী অধ্যায়ও দুঃখজনক। তার আলোচনা এ পুস্তিকায় আমরা ইতিপূর্বে করে এসেছি। এখানে রাশিয়ার দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সকল বাহিনীকে টেক্কা দিয়ে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফাঁকে তালেবান গঠন, তাদের জয়ী হওয়া এবং তাদের সরকার গঠনের মূলে একটি মুসলিম দেশ ও একটি পরাশক্তির ভূমিকা সারা দুনিয়ার বিবেকবান মানুষের কাছে অজানা নয়। এখান থেকে ওসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বে আল কায়েদা বাহিনী গড়ে ওঠা এবং তাদের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা হওয়ার বিষয়টি পুরোটাই একটি রহস্য ঘেরা কাহিনী। মিডিয়ায় এদের আবির্ভূত হওয়ার পেছনে কাদের গোপন হাত রয়েছে, কারা কলকাঠি নাড়ছে ? সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মোক্ষম সময় বিন লাদেনের ভিডিও টেপ প্রচারের বিষয়টি আরো জোরালো প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। এযাবতকাল বিশ্বের দেশে দেশে চলে আসা ইসলামী আন্দোলনের সাথে এদের আদৌ কোনো সম্পৃক্ততার তথ্য আমাদের জানা নেই। বরং শোনা যায় যারা এখন তাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, যাদের জন্য বিন লাদেন এখন মাথা ব্যথার কারণ, তিনি তাদের এক সময়ের শুধু ব্যবসায়ী পার্টনারই নন, পারিবারিকভাবেও ঘনিষ্ঠজন। আফগানিস্তানে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিরোধ আন্দোলনের আগে তার পরিচিতি ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসাবে কোথাও ছিল, এমন তথ্য প্রমাণ কারো কাছে আছে বলে আমাদের জানা নেই।

তিনি এ পরিচিতি অর্জন করেছেন আফগানিস্তানে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সহযোগিতায়। অতএব এদের কারণে অথবা এদের কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আন্দোলনকে এবং সংগঠন অথবা আদর্শ হিসাবে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িত করা, অভিযুক্ত করা সম্পূর্ণ অন্যায়, অযৌক্তিক ও ন্যায় বিচারের পরিপন্থী।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে উপমহাদেশে কাশ্মীর ইস্যুটিও আলোচনার বিষয় হিসাবে আসে। উপমহাদেশ বিভক্তির সময় যে

www.pathagar.com

মূলনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তার আলোকে ন্যায়সংগতভাবেই কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভারতের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ গায়ের জোরে এটা হতে দেয়নি। বিষয়টি জাতিসংঘ পর্যন্ত গড়ায় এবং গণভোটের মাধ্যমে মীমাংসার জন্যে জাতিসংঘ প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু অর্ধশতাব্দীর বেশী সময় জাতিসংঘের এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি। কাশ্মীরের জনগণ আজ স্বাধীনতার জন্যে সশস্ত্র পথে যেতে বাধ্য হয়েছে। তাদের এ সশস্ত্র সংগ্রাম কতটা বাস্তবসম্মত, এতে সাফল্যের সম্ভাবনা আছে কি নেই এ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত বিষয়। এজন্যে এক তরফা স্বাধীনতাকামীদের সন্ত্রাসী হিসাবে আখ্যা দেয়া কতটা যুক্তিযুক্ত ? বিশ্ব বিবেকের কাছে কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী জনতা এ প্রশ্ন অবশ্যই রাখতে পারে। কোনো জনপদের মানুষের আবেগ-অনুভূতি আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় দেয়ার পরিবর্তে, রাজনৈতিক সমাধানের বাস্তবসম্মত উদ্যোগ না নিয়ে, একতরফা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের দমন করার প্রচেষ্টাকে নিন্দা না জানিয়ে, বাধা না দিয়ে, অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দেয়া অবশ্যই ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। কাশ্মীর ইস্যু সম্পূর্ণরূপে কাশ্মীরীদের ইস্যু, তাদের জন্মগত ও মানবিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইস্যু। এটার সাথে ইসলামী জঙ্গীবাদ জুড়ে দেয়ার কোনো কারণ নেই। কাশ্মীর ইস্যু পাকিস্তান অর্জনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি ইস্যু। আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের কোনো শাসক ইসলাম কায়েম করেনি বরং ইসলাম কায়েমের পথে বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। অতএব এটার জন্যেও ইসলামকে টেনে আনার কোনো সুযোগ নেই।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের সর্বশেষ ক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে ইরাক। ইরাকের নেতা সাদ্দাম কোনো বিচারেই ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। তিনি নিজের দেশে ইসলামী আন্দোলনকে নির্মূল করেছেন। ইরানের ইসলামী বিপ্লব নস্যাৎ করার জন্য মার্কিনীদের বন্ধু হিসাবে দশ বছর যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। পশ্চিমা জগতের কাছে আধুনিক প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে তিনি সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তার কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব মুসলিম

www.pathagar.com

বিশ্বের কোনো ইসলামী সংগঠনের উপরে চাপানোর প্রশ্নটি অবান্তর। অবশ্যই ইরাকের ঘটনা থেকে সারা বিশ্বের মুসলিম নামধারী তথাকথিত প্রগতিশীল, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের শিক্ষা গ্রহণের অনেক উপাদান রয়েছে। এরাও নিজের দেশে ইসলামিক শক্তিকে ঘায়েল করার জন্য, ইসলামের দুশমনদের কাছে প্রিয় হওয়ার জন্যে যেসব কাল্পনিক তথ্য সরবরাহ করে আত্মঘাতি তৎপরতা চালাচ্ছে, ইরাক, আফগানিস্তানের মত পরিস্থিতি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাচ্ছে, খোদা নাখাস্তা এমনটি ঘটলে সাদ্দামের মত তারাও রেহাই পাবেন না। সাদ্দাম ইসলামী শক্তিকে খর্ব করার জন্যে পশ্চিমা শক্তিকে এত সুযোগ দিয়ে, এতো সহযোগিতা করেও যখন পার পাননি, তখন অন্যদের পার পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম শিক্ষার এটাও একটা দিক যে, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষাগ্রহণ করে না।

www.pathagar.com

২. ধর্মীয় জঙ্গীবাদ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এ দেশের শতকরা ৮৭ ভাগ মানুষ মুসলমান। প্রায় ৭০ হাজার গ্রাম অধ্যুষিত এ দেশটিতে ৩ লক্ষাধিক মসজিদ ও হাজার হাজার মাদ্রাসা রয়েছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ধর্মপ্রাণ মুসলমান।

এর পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টধর্মে বিশ্বাসী লোকেরাও স্বচ্ছন্দে, স্বাধীনভাবে এখানে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে আসছে। দেশ বিভাগকালীন সময়ের অবাঞ্ছিত কিছু অনুল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়া ধর্মের ভিত্তিতে এদেশে কোনো সংঘাত-সংঘর্ষের নজির নেই। যুগ যুগ ধরে হিন্দু মুসলিমসহ সকল ধর্মের লোকেরা সৎ প্রতিবেশী ও পরম আত্মীয়ের ন্যায় শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান করে আসছে। এটা বাংলাদেশের অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অনুসরণীয় ঐতিহ্য।

বাংলাদেশ যেমন ধর্মীয় মূল্যবোধের গৌরবোজ্জল ঐতিহ্যের ধারকবাহক, তেমনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যেরও অধিকারী। বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি পর্যায়ে যখন উপমহাদেশ বিভক্ত হয় তখন এ জনপদের লোকেরা স্বতন্ত্র জাতিসত্তা সংরক্ষণের তাগিদে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে ভারত বিভক্তির পক্ষে সবচেয়ে বেশী জোরালো ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রতিটি অন্যায় পদক্ষেপের জোরালো প্রতিবাদ করে তারা গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে। '৪৮ ও '৫২-তে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার আন্দোলন থেকে শুরু করে পূর্ব ও পশ্চিমের বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন ও সংগ্রামে তারা অংশ নিয়েছে, তাও ছিল অহিংস ও নিয়মতান্ত্রিক। এ জনপদের গণমানুষের স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং '৭০-এর নির্বাচন পর্যন্ত পুরোটাই গণতান্ত্রিক, নিয়মতান্ত্রিক ও অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন রূপে পরিচালিত হয়। '৭০-এর নির্বাচনের রায়ের প্রতি তৎকালীন ইয়াহিয়া সরকারের সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থতার পটভূমিতেই

www.pathagar.com

স্বাধিকারের আন্দোলন স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ নেয়। মূলত, এটা ছিল একটা চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ।

জনগণের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে যথানিয়মে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে হয়তো ইতিহাস হতো ভিন্ন। জনগণ তাদের নির্বাচনের রায় নস্যাৎ করার প্রেক্ষিতে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্যেই। তাই দ্বিধাহীন চিত্তে একথা বলা যায়, বাংলাদেশ ধর্মীয় মূল্যবোধের দেশ হওয়ার পাশাপাশি গণতন্ত্রের দেশও বটে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসলই আজকের বাংলাদেশ। একটি সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃষ্টি হলেও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সরকার পরিচালনার দায়িত্ব তারাই গ্রহণ করেছে যারা '৭০-এর নির্বাচনে জনগণের ভোটে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের পর দ্রুত সময়ের মধ্যেই সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ধারা চালু হয়। তথাকথিত সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী কোনো রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এ ধারা নস্যাত করতে পারেনি। এতে প্রমাণিত হয় এ দেশে সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বাইরে কোনো রাজনৈতিক দর্শনের স্থান নেই। গণতান্ত্রিক চেতনা সম্বলিত এ রাজনীতির ধারা এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে পরিচালিত ভোটাধিকারসহ গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া আদায়ের দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে। অতএব এ ঐতিহ্যের শিকড় এখানে মাটির গভীরে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ দেশে সন্ত্রাসনির্ভর ও জঙ্গী কোনো রাজনৈতিক দর্শন, তা যে কোনো নামেই আর যে পরিচয়েই হোক না কেন, ঠাঁই পেতে পারে না। আর ধর্মীয় জঙ্গীবাদের তো প্রশ্নই উঠে না। কারণ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির যে ধারা, তার রূপায়নে দেশের ইসলামী জনতা এবং ইসলামী নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনই প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করে।

❐

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইসলামী দলসমূহের ভূমিকা ঃ একটি পর্যালোচনা

'৪৭-এর ভারত বিভক্তির পূর্বে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল ২টি। একটি মুসলিম লীগ আরেকটি কংগ্রেস। উভয় দলই বৃটিশ মডেলের পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীর আদলেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। দেশের আলেম সমাজও এ সময় বিভক্ত ছিল। একটি অংশ ওলামায়ে হিন্দের ব্যানারে কংগ্রেসের সাথে মিলে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখে। অপরটি ওলামায়ে ইসলামের ব্যানারে উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা সংরক্ষণের জন্যে মুসলিম লীগের সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে তৃণমূল পর্যায়ে এরাই ছিলেন আন্দোলনের প্রধান শক্তি। উপমহাদেশ বিভক্তির পর তৎকালীন পাকিস্তানের যাত্রালগ্নে এ দলগুলো স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে জনগণের নেতৃত্বে থেকে যায়।

উপমহাদেশের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের একটি পর্যায়ে যখন ভারত বিভক্তির প্রশ্ন আসে মুসলিম জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে, তখন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) তাঁর তরজুমানুল কুরআন পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র রক্ষার পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করেন।

'মাসআলায়ে কাওমিয়াত' (ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ) নামক গ্রন্থটি মুসলিম লীগের আন্দোলনকে শক্তি যোগায়। কংগ্রেস উপস্থাপিত সর্বভারতীয় জাতীয়তার পক্ষে ওলামায়ে হিন্দের কতিপয় নেতার সমর্থন ও যুক্তি প্রদর্শনের মোকাবেলায় আল্লামা ইকবাল ও মাওলানা মওদূদীর লিখনী ছিল মুসলিম লীগের প্রধান হাতিয়ার। তাছাড়া "মুসলমান আওর সিয়াসি কাশমাকাশ" নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত পুস্তকটিও সেই সমস্যায় মুসলিম লীগের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক দিকনির্দেশনার কাজ করে। এতদসত্ত্বেও মাওলানা মওদূদী (র) মুসলিম লীগে যোগদান করেননি। মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র আবাসভূমিতে ইসলামী শাসন বা কুরআনী

www.pathagar.com

শাসন কায়েমের যে শ্লোগান দিচ্ছিল, তা কার্যকর করার উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি ১৯৪০ সনে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন ; যার শিরোনাম ছিল 'ইসলামী হুকুমত কিসতরাহ কায়েম হুতি হায়', যা বাংলায় 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' নামে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এটিই ছিল মূলত মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে তাদের শ্লোগানে উচ্চারিত ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্যে একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রস্তাব।

এ প্রস্তাব মুসলিম লীগ দ্বারা বিবেচিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। অতএব মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দর্শন মুসলিম জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র সংরক্ষণের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও মাওলানা মওদূদী (র) সরাসরি এতে শরীক না হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের উপযোগী পরিবেশ ও লোক তৈরীর লক্ষে ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী গঠন করেন এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ভারত বিভক্তি উত্তর পরিস্থিতিতে ভারতের মুসলমানদের প্রতি দায়িত্ব পালন ও পাকিস্তানে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কার্যকর ও বাস্তবসম্মত ভূমিকা পালনের জন্যে জ্ঞান-গবেষণা ও ব্যক্তি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিভাগপূর্ব সময়ে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর একটি সম্মেলনে ভারতে যেসব মুসলমানরা রয়ে যাবে, পাকিস্তান হওয়া সত্ত্বেও তারা কিভাবে ইসলামের প্রচার প্রসারে মুসলমানদের পক্ষে ভূমিকা রাখবেন তার দিকনির্দেশ দেন এবং নিজে তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে পাকিস্তানে হিজরত করেন। যে শ্লোগানের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয় সেই ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমে পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ওলামায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে তিনি সরকারকে সাহায্য সহযোগিতা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এভাবেই ভারত বিভক্তি উত্তর তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে মুসলিম লীগ ও তার সহায়ক শক্তি ওলামায়ে ইসলামের পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা যোগ হয়। যদিও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কার্যক্রম আরো বিলম্বে শুরু হয়।

আমরা এখানে আজকের বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তৎকালীন পাকিস্তানের শুধু এ অংশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমকে আলোচনায়

www.pathagar.com

আনতে চাই। পাকিস্তানের যাত্রা লগ্নেই শাসক গোষ্ঠীর ইসলাম বিরোধী ও গণতন্ত্র বিরোধী মন-মানসিকতার প্রকাশ ঘটতে শুরু করে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় জনগণ ধাপে ধাপে বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী হয়ে উঠে।

পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর প্রথম ভুল পদক্ষেপ ছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত। এর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে যারা প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের মধ্যে মওলানা আকরাম খাঁ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেম প্রমুখ সবাই ছিলেন ইসলামী আদর্শের পক্ষের লোক। আবার পাকিস্তান আন্দোলনে ছিল এঁদের জোরালো ভূমিকা। সেই সময়ে ছাত্র নেতা হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে অধ্যাপক গোলাম আযম ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তিনি তখনো জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান না করলেও ইসলামী আদর্শের অনুসারী ছিলেন এবং তমুদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে ইসলামী রাজনীতি চর্চা করতেন। এ সময়ে এ অঞ্চলে ইসলামী দল হিসাবে তিনটি দলেরই আমরা নাম উল্লেখ করতে পারি। তখনকার অবস্থায় বৃহত্তর ইসলামী দল ছিল নেযামে ইসলাম পার্টি যা বিভাগ পূর্ব সময়ে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম নামে মুসলিম লীগের সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এজন্যে নেযামে ইসলাম পার্টি (NIP) নামের সাথে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামও লেখা থাকতো। আর দ্বিতীয়টি হলো খেলাফতে রাব্বানী পার্টি, যার সাংস্কৃতিক উইং ছিল তমুদ্দুন মজলিস। এটি সাংস্কৃতিক ময়দানে খেলাফতে রাব্বানী পার্টির অংগ সংগঠন হিসাবে কাজ করতো।

জামায়াতে ইসলামীর নাম আমরা তিন নাম্বারে এনেছি এজন্যে যে, জামায়াতের কাজ তখন প্রাথমিক পর্যায়ে। '৫৪-এর নির্বাচনে জামায়াত অংশ নেয়নি বা অংশ নেয়ার মতো অবস্থাও ছিল না। কিন্তু শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানীর সাথে মাওলানা আতাহার আলী সাহেবের নেতৃত্বে নেযামে ইসলাম পার্টি এবং প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেম-এর নেতৃত্বে খেলাফতে রাব্বানী পার্টি যুক্তফ্রন্টে শামিল হয়ে '৫৪-এর নির্বাচনে অংশ নেয় এবং মুসলিম লীগকে চরমভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। এখানে উল্লেখ্য, যুক্তফ্রন্ট গঠিত

www.pathagar.com

হয়েছিল শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টি (কেএসপি), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ, মাওলানা আতাহার আলী সাহেবের নেতৃত্বে নেযামে ইসলাম ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম এবং খেলাফতে রাব্বানী পার্টির সমন্বয়ে।

আমাদের আলোচনার মূল বক্তব্য হলো এদেশে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে যারা রাজনীতি চর্চা করে তাঁরা ইসলাম ও গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে সবসময় ছিল সক্রিয়। যুক্তফ্রন্টের এ ঐক্য অবশ্য বেশী দিন টেকেনি। ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে যুক্ত নির্বাচনের প্রশ্নে নতুন করে মেরুকরণ হয়। মুসলিম লীগ, নেযামে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামী উপরোক্ত ইস্যুতে ভিন্ন অবস্থান নিয়ে আন্দোলন করেছে।

১৯৫৮ সনের অক্টোবরে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও সামরিক শাসন জারির প্রেক্ষাপটে নতুন করে দেশে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন ও সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্যে আন্দোলন শুরু হয়। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে তৎকালীন আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগের এক অংশ খাজা খয়ের উদ্দিনের নেতৃত্বে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নূরুল আমীন সাহেবের নেতৃত্বে NDF, মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামায়াতে ইসলামী এবং নেযামে ইসলাম পার্টি সমন্বয়ে গঠিত হয় কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি (COP)। '৬৫ সনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে মিস ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, ন্যাপের পাশাপাশি ইসলামী দলগুলো ভূমিকা রেখেছে। এখানে মূল বিষয় ছিল স্বৈরতন্ত্রের, একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে জনগণের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) ও ডেমোক্রেটিক একশান কমিটি (DAC) সবকটিতেই জামায়াতে ইসলামীসহ এদেশের পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত ইসলামী দলগুলো নিষ্ঠার সাথে ভূমিকা রেখেছে। মানুষের ভোটাধিকার আন্দোলনের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখার কারণে '৬৪ সনের ৪ঠা জানুয়ারীতে তৎকালীন আইয়ুব সরকার পাকিস্তানের উভয়

www.pathagar.com

অংশে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে এ পুস্তকে করেছি। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ বিজয় লাভ করে। সেই সফল গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ইসলামী দলের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবীতেও জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামী দলগুলো ছিল সোচ্চার। নির্বাচনের রায়ের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়ার কারণে নয় মাস ব্যাপী স্বাধীনতার জন্যে যে যুদ্ধ পরিচালিত হয় সেই যুদ্ধে কোনো ইসলামী দল বা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরাসরি শরীক হতে পারেনি। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় লাভের পর এরা বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নেয় এবং বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী কোনো কাজে অংশ নেয়নি। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রথম সরকারের সাড়ে তিন বছরের মেয়াদকালে কোনো ইসলামী দল বা সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারকে কোথাও বিব্রত করা হয়নি। এ সাড়ে তিন বছর মেয়াদকালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারকে যারা বিব্রত করেছে তাদের এক অংশ '৬০-এর দশকের শেষার্ধে পশ্চিম বাংলার নকশাল বাহিনীর আদলে গলাকাটা রাজনীতির দর্শনে বিশ্বাসী। বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের বিভিন্ন উপদল পরবর্তী পর্যায়ে নকশালপন্থী অথবা সর্বহারা নামে পরিচিত হয়েছে।

অপর অংশটি আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসা বিদ্রোহীদের নিয়ে গঠিত। যা জাসদ নামে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শ্লোগান নিয়ে মাঠে নামে ও ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে বাইরে গণবাহিনী নামক সশস্ত্র ক্যাডার গড়ে তোলে সশস্ত্র বিপ্লবের লক্ষে। এ 'গণবাহিনী এবং সর্বহারা' কর্তৃক হত্যাকাণ্ডসহ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রেক্ষাপটে '৭৪ সনের জানুয়ারীতে আওয়ামী লীগ সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বাতিল করে রাষ্ট্রপতি শাসিত একদলীয় বাকশাল (BAKSAL) গঠন করে। বাংলাদেশী রাজনীতির এ অধ্যায়ের আলোচনা পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়, সশস্ত্র ও সন্ত্রাসী রাজনীতি চর্চার সাথে এ দেশের ধর্মীয়

www.pathagar.com

দলগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। এ রাজনীতি চর্চায় সিদ্ধহস্ত তারাই যারা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে চাই স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রালগ্নে মুসলিম লীগ, PDP, KSP, জামায়াতে ইসলামী ও নেযামে ইসলাম পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এদের নেতা কর্মীদেরকে জেলে আটক করা হয়, অনেককে হত্যা করা হয়। অনেকের বাড়ীঘর লুটতরাজ ও ধ্বংস করা হয়। কিন্তু এসব দলের নেতাকর্মীরা কোনো অবস্থায় প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতিতে জড়িত হয়নি। মরহুম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এ দলগুলোর সাথে '৫০ ও '৬০-এর দশকে এক সাথে গণতন্ত্র, স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকারের জন্য আন্দোলন করেছেন। এসব দলের নেতৃবৃন্দের অনেককে তিনি মুরুব্বি হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন। অনেকের সাথে বন্ধু হিসাবে সুসম্পর্ক রাখতেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন তারা রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ হতে পারে কিন্তু তারা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে অভ্যস্ত, এদের দ্বারা কোনো উগ্রপন্থী, চরমপন্থী রাজনীতির আশংকা নেই। সেই সময়ের দুজন যারা ছিলেন জাতির অভিভাবকতুল্য, একজন অধ্যাপক আবুল মনসুর আহমদ এবং অপরজন জাতীয় অধ্যাপক আবুল ফজল সাহেব। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় লেখার মাধ্যমে মরহুম নেতা শেখ মুজিবকে তাঁরা উপদেশ দিয়েছিলেন, দেশের গ্রামাঞ্চলের আইন শৃংখলা রক্ষায় ঐসব দলের নেতা কর্মীগণ যাতে ভূমিকা রাখতে পারেন। কারণ তাদের মতে এদের ছিল একটা সামাজিক অবস্থান। এরা সর্বহারা ও গণবাহিনীর কার্যক্রমের মোকাবেলা এবং সরকারের সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করতে পারে। এ বিবেচনায় মরহুম নেতা শেখ মুজিব সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। আওয়ামী নেতৃবৃন্দের একজন ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক মরহুম নাজিমুদ্দিন মানিক একাধিকবার ব্যক্তিগত আলোচনায় বলেছেন, মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় এটাও প্রকাশ করেছেন, এদেরকে রাজনীতি করার সুযোগ দিলে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চাই এরা করবে। অন্যথায় এদের কর্মীদেরকে বামপন্থীরা অনিয়মতান্ত্রিক সহিংস রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেলতে পারে।

www.pathagar.com

'৭৫ পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ধারায় ইসলামী দলগুলো সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের রাজনীতি চর্চা বাংলাদেশে আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির ধারায় স্বাধীনতা পূর্ব ইসলামী দলগুলোর মধ্য থেকে জামায়াতে ইসলামী মুখ্য ভূমিকায় আছে। স্বাধীনতা পূর্বকালের অন্যতম প্রধান ইসলামী দল নেযামে ইসলাম পার্টি, যাদের প্রভাব বলয় ছিল মূলত কাওমী মাদ্রাসা কেন্দ্রিক। তারা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সক্রিয়ভাবে তাদের প্রভাববলয়ের লোকদেরকে পুনর্গঠিত করতে সক্ষম না হওয়ায় যে শূন্যতা বিরাজ করছিল সেই শূন্যতা পূরণে ৮০-এর দশকের সূচনায় এগিয়ে আসেন হযরত মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর। তিনি দল গঠনেরও আগে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারায় শামিল হন। উক্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লব্ধ সমর্থন ধরে রাখার জন্যে তিনি খেলাফত আন্দোলন নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত আন্দোলনের সংগঠনভুক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বর্তমানে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের নেতৃত্বাধীন খেলাফত মজলিস, মুফতী ফজলুল হক আমিনীর নেতৃত্বে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি, মাওলানা ফজলুল করিম পীর চরমোনাই-এর নেতৃত্বে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, হাফেজ্জী হুজুরের ছেলে মাওলানা আহম্মদ উল্লাহ আশরাফের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন সবকটাই মূলত প্রাচীনতম ইসলামী দল, নেযামে ইসলাম ও জমিয়তে ওলামা ইসলামের উত্তরসূরী। এদের কারো কারো কথায় কখনো কখনো কিছুটা উগ্রতা এবং অতি বিপ্লবীভাবের প্রকাশ ঘটলেও মূলত এরাও নেযামে ইসলামের উৎস হিসাবে এবং বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারার সাথেই সম্পৃক্ত।

'৮০-এর দশকে সামরিক স্বৈরতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রথমে ১৫ দল, পরে ৮ দল ; বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দল যে আন্দোলন করেছে তার পাশাপাশি ইসলামী দলগুলো বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অর্থবহ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার জন্যে সংবিধানে আজ কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা সংযোজিত হয়েছে। এরপরে তিনটি নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে এবং নির্বাচন ব্যবস্থা দেশের ভিতরে বাইরে স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এটা মূলত এ দেশের ইসলামী দল হিসাবে জামায়াতে ইসলামীরই অবদান। অতএব এ দেশের ইসলামী রাজনীতি চর্চার গঠনমূলক অবদান এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের যথাযথ মূল্যায়ন যদি কেউ করতে সক্ষম হন, তাহলে এদেশে ইসলামী রাজনীতিকে জঙ্গীবাদী, উগ্রবাদী বা চরমপন্থী হিসাবে চিহ্নিত করতে তিনি পারবেন না। এরপরও যারা এ প্রশ্ন সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালান তারা জ্ঞানপাপী। না হয় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ইসলামের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করার স্বার্থেই জেনেশুনেই হয়তোবা এটা করছেন। নতুবা কোনো মহল বিশেষের ক্রীড়নকের ভূমিকায় মনের অজান্তে ইসলাম বিরোধী, দেশ বিরোধী অপশক্তির নীল নকশা বাস্তবায়নে তারা সহায়তা করে যাচ্ছেন, যা কোনো অবস্থাতেই বাঞ্ছিত হতে পারে না।

আমরা বিগত আওয়ামী লীগ শাসন আমল থেকে কিছু আজগুবি নাম, ঠিকানাবিহীন ব্যক্তি ও সংগঠনের নাম শুনে আসছি পত্র-পত্রিকায়। যার সংখ্যা ও নামগুলো মূলত আওয়ামী ঘরনার তৈরী। এর কোনোটার সাথে বাংলাদেশের পরিচিত প্রতিষ্ঠিত ইসলামী দল, সংগঠন ও সংস্থা ও ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক আছে বলে আমাদের জানা নেই। একজন প্রগতিশীল, এককালের বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক ও কলামিস্ট জনাব ফরহাদ মজহার সাহেব একটি পত্রিকার উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে এ সম্বন্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের বর্ডার এলাকায় কিছু ধর্মীয় জঙ্গীবাদী সংগঠনের পেছনে ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার হাত রয়েছে।' তথ্যটি সত্য হলে আমাদের দাবী জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তাহলো ইসলামের উপর আঘাত হানার ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য মহল বিশেষ তাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধরনের সংগঠন তৈরী করছে এবং তাদেরকে উগ্রবাদী ইসলামপন্থী হিসাবে চিহ্নিত করে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী

www.pathagar.com

সংগঠনের অংগ সংগঠন হিসাবে চালিয়ে ইসলামী আন্দোলনের মূল ধারার উপর আঘাত হানতে চাচ্ছে। এটাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের খোড়া অজুহাত সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। জনাব ফরহাদ মজহার সাহেবের কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ততা আছে বলে আমাদের জানা নেই। অতএব তাঁর বক্তব্যকে নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ এবং দেশের স্বার্থচিন্তায় উদ্বুদ্ধ এটা মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

বাংলাদেশে নাম ঠিকানাবিহীন অখ্যাত, অজ্ঞাত, অর্বাচীন ব্যক্তিদের নাম সর্বস্ব বা কাগুজে সংগঠনের ঢালাও প্রচার খুবই দুঃখজনক এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সংগঠন গড়ে তোলা কোনো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। এ দেশে বিভিন্ন ধারার রাজনৈতিক সংগঠনের স্প্লিন্টার গ্রুপ (Splinter Group) বা উপদলের ইতিহাস কারো অজানা নয়। এগুলোর প্রায় সবগুলোরই আঁতুড় ঘরে অপমৃত্যু ঘটেছে। অতএব কেউ কিছু একটা চাইলেই করে ফেলবে এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। যারা এসব গ্রুপকে নিয়ে বেশী বেশী লেখালেখি ও মাতামাতি করেন তারা নিজেরাও যে এ বিষয়টি জানেন না এমন নয়। যেহেতু ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে ইসলামের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করাই তাদের লক্ষ্য ; তাই জেনেবুঝেই এ বিবেক বিরোধী কাজটি তারা অব্যাহতভাবে করে চলেছেন, যার অশুভ পরিণতি জাতিধর্ম, দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্যে ভয়ংকর। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলো বাংলাদেশ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপপ্রয়াস শুরু করেছে। সাম্প্রতিক ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ, বাংলাদেশকে উগ্রবাদী, মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য হিসাবে উল্লেখ করে যে প্রতিবেদনটি ছাপে, তা যে কাল্পনিক, ভিত্তিহীন, জঘন্য ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

তাছাড়া টাইম ম্যাগাজিনে 'ডেডলি কার্গো' নামের প্রতিবেদনটিতেও আরেকটি আজগুবি গাঁজাখুড়ি কল্পকাহিনী ফাঁদা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য খুবই কুৎসিত ও জঘন্য। এসব প্রচারণার ফল কত মারাত্মক হতে পারে তার একটি ছোট্ট উদাহরণ আওয়ামী লবীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টে বাংলাদেশ সম্পর্কিত একটি

www.pathagar.com

রেজ্যুলেশন। যাতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে এ মর্মে অভিযুক্ত করা হয় যে তাদের যৌথ অভিযানে আর সব দলের সন্ত্রাসীরা ধরা পড়লেও জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেউ ধরা পড়ছে না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টের উক্ত রেজ্যুলেশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে অভিযুক্ত করে এ তথ্যও জুড়ে দেয়া হয়, তাদের ভাষায় জামায়াতে ইসলামীতেও নাকি সশস্ত্র ক্যাডার আছে।

তাদের এ অভিযোগকে হালকা করে দেখা আমরা সমীচীন মনে করি না। বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে তারা এভাবে বিতর্কিত করে, মৌলবাদী হিসাবে চিহ্নিত করার অপ্রয়াস চালিয়েছে। যার লক্ষ্য খুবই সুদূর প্রসারী। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি, একটি বিশেষ দেশের গোয়েন্দা সংস্থার রাজনৈতিক প্রতিবেদনে তিনটি শক্তিকে তারা বাংলাদেশ সংক্রান্ত তাদের নীলনকশা বাস্তবায়নের পথে বাধা ও প্রতিবন্ধক মনে করে। তার এক নাম্বারে সেনাবাহিনী, যে সেনাবাহিনী জন্ম নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য ধারণ করে, মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তারা জানে এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত কোন্ দিক থেকে আসতে পারে। আমাদের সেনাবাহিনী স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহ্যের ধারকবাহক হওয়ার সাথে সাথে তারা জাতীয় ঐক্যেরও প্রতীক। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় রয়েছে তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দেশের শান্তি রক্ষা বাহিনীতে সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনকারী একটি সুশৃংখল বাহিনীর উপর মৌলবাদের অপবাদ অথবা মৌলবাদীদের তথাকথিত পৃষ্ঠপোষকতার অপবাদের লক্ষ্য কি তা দেশপ্রেমিক জনগণকে অবশ্যই তলিয়ে দেখতে হবে।

ঐ বিশেষ দেশের গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে তাদের নীলনকশা বাস্তবায়নের পথে দ্বিতীয় বাধা হলো এ দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। সম্ভবত এ কারণেই আওয়ামী শাসন আমলে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচারণা জোরদার করা হয়। দেশী-বিদেশী সংবাদ মাধ্যম ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রধান কারণ এটাই।

www.pathagar.com

ঐ প্রতিবেদনের আলোকে তাদের নীল নকশা বাস্তবায়নের পথে তৃতীয় বাধা নাকি জামায়াতে ইসলামী। তাই দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে জামায়াত বিরোধী প্রচারণায় সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত করা হয়েছে। তাদের লাগাতার প্রচারণার পাশাপাশি জনাব ফরহাদ মজহার সাহেবের নিবন্ধে উপস্থাপিত তথ্য মিলিয়ে দেখলে প্রতিবেদনটির অস্তিত্ব অবান্তর বা অবাস্তব মনে করতে পারি না। দেশের স্বার্থ যাদের কাছে প্রধান বিবেচ্য বিষয় তারা দেশের স্বার্থে উল্লিখিত তিনটি শক্তি, যাকে মহল বিশেষ তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ মনে করে এর যথাযথ মূল্যায়নে এগিয়ে আসবেন এটাই দেশপ্রেমের দাবী। সেই সাথে বাংলাদেশে তথাকথিত ধর্মীয় জঙ্গীবাদ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রচারণার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে আপামর জনতা সজাগ সচেতন হয়ে এসব প্রচারণার যথার্থ মোকাবেলায় এগিয়ে আসবেন। এদের দুরভিসন্ধি ও অপপ্রয়াস ভণ্ডুল করার জন্যে দেশের ইসলামী শক্তিকে আরো বেশী সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। সেইসাথে ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নীতি-নৈতিকতার বিকাশ নিশ্চিত করার জন্যে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেবেন, এটাই সময়ের দাবী।

আমরা পরিশেষে বলতে চাই, বাংলাদেশে সন্ত্রাসনির্ভর রাজনীতির আমদানীকারক ও ধারকবাহক হলো এক সময়ের বাম রাজনৈতিক দলসমূহের কতিপয় উপদল। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন পকেটে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থী, সর্বহারা অথবা জনযুদ্ধ। অথচ দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যমে যারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলে প্রতিবেদন প্রচার করেন তাদের এ নিয়ে যেমন মাথাব্যথার প্রমাণ পাওয়া যায় না ; তেমনি বিভিন্ন দেশের সরকারী, বেসরকারী বিভিন্ন ব্যক্তি, যারা বাংলাদেশ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে আসেন তাদেরও ঐসব চরমপন্থী, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো মাথাব্যথা দেখা যায়নি। অথচ তারা ব্যস্ত কাল্পনিক ও নাম ঠিকানা বিহীন কিছু ভুই ফোঁড় সংগঠনের অতিরঞ্জিত সংবাদ নিয়ে। এটা রীতিমত

www.pathagar.com

রহস্যজনক। দেশের বিবেকবান বুদ্ধিজীবি ও সাংবাদিকদের অবশ্যই এ রহস্য উদঘাটনে এগিয়ে আসা উচিত।

উপসংহারে বলতে চাই, বাংলাদেশ ইসলামী মূল্যবোধের দেশ, গণতান্ত্রিক চেতনার দেশ। কোনো মহল এ মূল্যবোধের পরিপন্থী কোনো কিছু এদেশের মানুষের উপরে কখনো চাপিয়ে দিতে পারবে না। এ দেশের ইসলামী শক্তি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারক-বাহক ও পৃষ্ঠপোষক। আজগুবি প্রচারণায় তাদের অগ্রযাত্রা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কারণ মিথ্যা দিয়ে সত্যকে বেশীদিন ঢেকে রাখা যায় না।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত

লেখকের অন্যান্য বই

- কুরআনের আলোকে মুমিনের জীবন
- আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
- ইসলামী আন্দোলন, সমস্যা ও সম্ভাবনা
- মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য
- গণতন্ত্র, গণবিপ্লব ও ইসলামী আন্দোলন
- বক্তৃতামালা

www.pathagar.com